ইস্তেগাসা

সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

E1

مسئلہ استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت

সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান

মূল

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর

মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহসান

সম্পাদনা

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَّسَـلِّمْ دَآئِـمًا أَبَـدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ

وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَـهُمْ

أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْـحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

মূল : শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর : মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহসান

সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম

ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ১৮ জুলাই ২০১১, ১৫ শাবান ১৪৩১, ৩ শ্রাবণ ১৪১৮ বাংলা

মূল্য : ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

Sahaijjo Prattanar Saryi Bidan. By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated By: Mawlana Kazi Md. Kamrul Ahsan. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 100/-

প্রকাশকের কথা

এস্তেগাসা (একজন অপরজন থেকে সাহায্য চাওয়া) বৈধ ও অবৈধ হওয়া নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। অথচ মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে একজন অন্য জনের উপর নির্ভরশীল। একজন অন্য জনের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং সাহায্য করা উভয় আল্লাহর নির্দেশ পালনের নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা সৎ ও ন্যায়ের কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য কর।" (সূরা মায়েদাহ)

নিঃসন্দেহে প্রকৃত সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তারপরও আমরা শত শত ব্যাপারে একে অপরের কাছে সাহায্য চাই এবং সাহায্য গ্রহণ করি। এটা তাওহীদের পরিপন্থি কিছু নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত নির্দেশের বাস্তবায়ন মাত্র। আল্লাহর কোন বান্দা থেকে কোন ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া ইসলামী শরীয়ত কতটুকু সাপোর্ট করে এবং এটার মূলভিত্তি কি এদত বিষয়ে কুরআন-হাদিসের প্রমাণ্য আলোচনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের বরণ্য ইসলামী স্কলার ড. আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী এ পুস্তকে এস্তগাসা বিষয়ে নানাদিকের উপর আলোচনা করত যাবতীয় সন্দেহের নিরসন এবং এ নিয়ে যাবতীয় বাড়াবাড়ি চিহ্নিত করত ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়াস পান। আশা করি এ পুস্তকটি পর্যালোচনা দ্বারা এতদ বিষয়ের সকল সন্দেহের নিরসন হবে।

এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা কাজী কামরুল আহসান। আমারা তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব।

ইমলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পবিত্র রমযান (১৪৩২ হিজরি) উপলক্ষে আয়োজিত ইসলামী বইমেলাকে কেন্দ্র করে বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শত-কোটি শুকরিয়া। আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন॥

সালামসহ
আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সনজরী পাবলিকেশন

সূচীক্রম

প্রথম অধ্যায়	১
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা চাওয়ার অর্থ	১
এস্তেগাসা (استغاثة) শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ	৩
এস্তেগাসা (استغاثة) এর প্রকারসমূহ	৫
কথার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা (استغاثه بالقول)	৫
কর্মের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা (استغاثه بالعمل)	৬
استغاثه ও توسل (সাহায্য প্রার্থনা ও অসীলা গ্রহণ) এর পারস্পরিক সম্পর্ক	৭
استغاثه এবং دعا এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য	৮
আল্লাহ তা'আলার বাণীতে দোয়া শব্দের ব্যবহার	৮
১. اَلنِّدَاءُ বা আহ্বান করা অর্থে	৮
২. اَلتَّسْمِيَةُ বা নামকরণ অর্থে	৯
৩. الإستغاثة বা সাহায্য চাওয়া অর্থে	১০
৪. اَلْحَثُّ عَلَي الْقَصْدِ কোন জিনিসের ইচ্ছায় উৎসাহিত করা অর্থে	১০
৫. اَلطَّلَبُ চাওয়া অর্থে	১০
৬. اَلدُّعَاءُ প্রার্থনা অর্থে	১১
৭. اَلْعِبَادَةُ ইবাদত অর্থে	১১
৮. اَلْخِطَابُ সম্বোধন অর্থে	১১
দোয়ার মনগড়া প্রকার	১২
১. ইবাদতের দোয়া	১২
২. চাওয়ার জন্য দোয়া	১৩
প্রকারের উপকারিতা বৈপরিত্য এখানে অনুপস্থিত	১৩
প্রথম উদাহরণ	১৪
দ্বিতীয় উদাহরণ	১৪
সূরা ফাতিহা এবং এস্তেআনাত ও এস্তেগাসার ধারণা	১৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯
তাজেদারে আম্বিয়া (দ)'র কাছে এস্তেগাসা বা সাহায্য চাওয়ার অর্থ ১৯
এস্তেগাসা : হাদিস শরীফ ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের আলোকে ২১
সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এস্তেগাসা ২৩
সৈয়্যদুনা কাদাতাহ ইবনে নূ'মান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এস্তেগাসা ২৪
ফোঁড়া আক্রান্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এস্তেগাসা ২৬
অন্ধ সাহাবীর এস্তেগাসা ২৭
একজন সাহাবীর বৃষ্টির জন্য এস্তেগাসা ২৮
সৈয়্যদুনা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাশেফুল কুরুবাত ২৯
তৃতীয় অধ্যায় ৩১
মৃত্যুর পর এস্তেগাসা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ ৩১
বরযখী হায়াত (কবর জীবন) এর প্রমাণ ৩৩
রূহের হায়াত এবং শক্তি ৩৭
চতুর্থ অধ্যায় ৪০
আপত্তি সমূহের উত্তর ৪০
প্রথম আপত্তি : এস্তেগাসা স্বয়ং একটি ইবাদত ৪০
সকল এস্তেগাসা ইবাদত হয় না ৪২
দ্বিতীয় আপত্তি : আসবাব উর্ধ্বের জিনিসগুলোতে এস্তেগাসা শিরক ৪৪
বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ৪৬
হাকীকত ও মাজায এর প্রকরণ করা অপরিহার্য ৪৮
আসবাব উর্ধ্বের বিষয়াদিতে মাজায বৈধ হওয়া ৪৯
হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের উপর শিরকের ফতোয়া ৪৯
সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর শিরকের ফতোয়া ৫১
প্রকৃত কর্ম সম্পাদনকারী হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতই ৫২
এটি কি মু'জিযা নয়? ৫২
আল্লাহ তা'আলার উপর শিরকের ফতোয়া? ৫৪
রূহ ফুঁৎকার করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাজ ৫৫
তৃতীয় আপত্তি : অন্যের কাছে এস্তেগাসাতে গায়েবী শক্তির আভাষ বিদ্যমান ৫৫
মনগড়া আকীদাগত ফিতনার খণ্ডন ৫৬
একটি সন্দেহের অপনোদন ৫৭
মখলুকের কাছে কী দূরের এলম থাকতে পারে? ৫৮
ফারুকে আযমের কাশ্‌ফ ৫৯
কাশ্‌ফ এবং ইলমে গায়েব এর পার্থক্য ৬০
নবী আলাইহিস সালামের প্রশ্ন করাটা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির কুদরত থাকার প্রমাণ ৬১
চতুর্থ আপত্তি : আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই ৬৫
এরূপ দলীল গ্রহণ বাতিল ৬৭
পঞ্চম আপত্তি : সওয়াল ও এস্তেগাসা শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই বৈধ ৬৮
সওয়াল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ৬৯
আরও চাও ৭১
এস্তেগাসা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ৭২
ষষ্ঠ আপত্তি : সরওয়ারে কায়েনাশ (দ)'র কাছে এস্তেগাসার নিষেধাজ্ঞা ৭৫
হাদিস মুবারকটির সঠিক অর্থ ৭৬
পঞ্চম অধ্যায় ৭৮
ঈমান ও কুফর এর মধ্যেকার পার্থক্য ৭৮
ঈমান ও কুফর এর মধ্যেকার রূপক সম্পর্কের বর্ণনা ৭৮
শেষ কথা ৮১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা চাওয়ার অর্থ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা। তিনি সর্বশক্তিমান এবং প্রকৃত সাহায্যকারী। নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের সকল জগতে প্রচলিত কার্যাবলী ও সকল এখতিয়ারের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন সেই পবিত্র সত্তা। যাঁর নির্দেশে দিন-রাতের ক্রমধারা বিদ্যমান। তিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে একক, অদ্বিতীয়, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। অগণিত সৃষ্টিকে জীবন দানকারী, তিনি একই সময়ে প্রদত্ত জীবনকে ছিনিয়ে নেন এবং প্রশস্ত ও বিস্তৃত জগতসমূহের শৃংখলা বিধানে কেউ তাঁর সাহায্যকারী এবং অংশীদার নেই। সকল জগতে ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং জীবন বিধানের সমৃদ্ধি দানকারী সত্তা শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতই। সৃষ্টিজগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নেই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ স্বয়ং কোন জিনিসের মালিক হতে পারে না। হয়ত তিনি স্বয়ং তাকে মালিক বানিয়ে দেবেন কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দান করবেন। এমনকি মানুষ তার স্বীয় সত্তা এবং ছয় ফুট শরীরের উপরও কোন কিছুর মালিক নয়। উপকার ও ক্ষতি, জীবন ও মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেরও কেউ স্বয়ং মালিক নয়। আল্লাহই মৃত্যু দান করেন। তিনিই জীবন দান করেন। আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস তাঁর কুদরতের আয়ত্বাধীন।

ইসলামের আহকাম ও কুরআনে হাকীমের চিরস্থায়ী ও অক্ষয় শিক্ষা সমূহের আলোকে বান্দার দিকে লাভ,ক্ষতি, মালিকানা ও ক্ষমতা প্রয়োগের সম্বন্ধ করাটা শুধু কারণ (سبب) এবং অর্জন (كسب) এর ভিত্তিতেই দুরস্ত রয়েছে। সৃষ্টি (ايجاد) ও সাধারণ শক্তি প্রয়োগ (قوت مطلقه) এর ভিত্তিতে মানুষের প্রতি লাভ ক্ষতি করার সম্বন্ধ করাটা অকাট্যভাবে দুরস্ত নয়। আমরা যদি গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করি, তাহলে দেখব যে, মানুষের প্রতি মৃত্যু, জীবন, লাভ, ক্ষতি, মালিকানা, ক্ষমতা প্রয়োগ এবং উহার পরিপূর্ণ অর্জনের (كسب) এর প্রকৃত সম্বন্ধ হয় না, বরং রূপকভাবে হয় এবং এ সকল বিষয়ে প্রকৃত সম্বন্ধের অধিকারী শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের সত্তা। এ হাকীকতসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে এবং কুরআন মজিদে বর্ণিত সুস্পষ্ট আয়াতমালা থেকে

মাসআলা নির্গত করাতে কিছু লোক শাব্দিক সুক্ষ্মবিষয় এবং মিশ্রিত আলোচনায় মেতে ওঠে মূল উদ্দেশ্য থেকে শূন্য হাতে থেকে যায়। বর্তমান যুগে সে সব লোকেরা কুরআনের আয়াতের অর্থ গ্রহণ করার সময় হাকীকত ও মজাযের মধ্যে পার্থক্য ও মাপকাঠির বিষয় ত্যাগ করে শুধু হাকীকী অর্থ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা দুরস্ত সাব্যস্ত করে থাকে। এমনকি তারা মজাযী (রূপক) অর্থ গ্রহণের বৈধতার বিষয় সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে। এই কারণেই তারা আসলাফ (পূর্ববর্তী) ইমামগণের পক্ষ থেকে কৃত ব্যাখ্যা তাফসীর ইত্যাদি থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। এবং আকাঈদের ব্যাপারে 'তাফসীর বিররাই' (মনগড়া ব্যাখ্যা) এর দ্বারা 'বেদআতে সাইয়্যেআত' (মন্দ বেদআত) তৈরি করা ও কুরআন সুন্নাহ্র প্রকৃত শিক্ষাসমূহ থেকে সরে গিয়ে নতুন নতুন আকীদাসমূহ জন্ম দেওয়াতে লিপ্ত। অপরদিকে শাব্দিক সন্দেহে বিভ্রান্ত অনেক মুর্খ জনসাধারণকেও আমরা পাচ্ছি, যারা মজাযের ব্যবহারে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত বিষয়ের প্রবক্তা এবং ন্যায়বিচারের আঁচল হাত থেকে ত্যাগ করে বসেছে। যদিও তারা অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের তাওহীদ, পবিত্রতা এবং অন্যান্য ইসলামী আকীদার উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা অধিক অধিক মজাযের ব্যবহারের দরুন 'মজাযী অর্থের অবৈধ হবার প্রবক্তা দলের' কাছে অপবাদের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তারা সত্যিকার বিষয়ের অন্বেষণে বহির্গত পরিমাপ ও ন্যায়বিচারের পথে অনুসন্ধান করছে। প্রকৃত ও রূপক (حقيقت و مجاز) এর ব্যবহারে কুরআনী মাপকাঠির ভিত্তিতে এ দুটো ভারসাম্য রক্ষা করা যায়, তবে ওই দ্বিধাবিভক্তি উম্মতকে আবার একই শরীরে পরিণত করতে পারে। এ পন্থাটিই দ্বীনে হক্বের সংরক্ষণ এবং তাওহীদের ক্ষেত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও মর্মার্থের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী।

ইসলামী আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে প্রাচীন আলিমদের মধ্য থেকে ইবনে তাইমিয়াকে বিরোধিতাকারী গণ্য করা হয়। অথচ প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার আকীদা অত্যন্ত সংযত দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি বর্তমান যুগে উহার যথাযথ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা হয়, তাহলে এটা দূরবর্তী নয় যে, বহু মতবাদকে পরস্পর নিকটবর্তী করা যাবে। প্রকৃত অবস্থা অনেকটা এরূপ যে, ইসলামী আকীদাসমূহের প্রতি নিজের বক্র অনুধাবনের ভিত্তিতে বিদ্আত প্রবেশকারী দল ইবনে তাইমিয়ার শিক্ষাসমূহের মনগড়া ধারণা পেশ করে। তার কাছ থেকে নিজের মনগড়া আকাঈদের অপ্রাসঙ্গিকভাবে সমর্থন অর্জন করছে। আর সহীহ ইসলামী আকীদাধারক

উম্মতের অল্প শিক্ষিত লোকেরা হাকীকতসমূহের ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে ইবনে তাইমিয়াকে অনৈসলামিক আকীদার বাহক মনে করতে লাগলেন।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা (استغاثة) সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার আকীদ হচ্ছে জমহুর আহলে ইসলামের আকীদা। তা হচ্ছে- "আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। শুধু তাঁরই ইবাদত করা বৈধ। তাঁরই কাছে দোয়া করা উচিত এবং তাঁকেই প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করতে হবে। তাঁর সত্তার উপর ভরসা করা উচিত এবং বিপদের সময় তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। গাইরুল্লাহ্কে প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করা ইসলাম হতে বহির্গত হবার নামান্তর। শুধু আল্লাহ্ই নেকীর তাওফিক দানে ধন্য করেন এবং গুনাহ ক্ষমা করার শক্তি রাখেন। তিনি ব্যতীত কেউ স্বয়ং কাউকে গুনাহ থেকে বাধা দান করতে পারে না এবং নেকীর তাওফিকও দিতে পারেনা। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের কাছে সাহায্য শুধু তাদেরকে রূপক সাহায্যকারী মনে করেই জায়েয।" এটাই প্রকৃত ইসলামী আকীদা এবং তা থেকে চুল বরাবর বিচ্যুতি আকাঈদে বাতেলার প্রাধান্য পাবার কারণ।

এস্তেগাসা (استغاثة) শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ

استغاثة শব্দের মূলধাতু غ- و- ث (غـوث)। এর অর্থ হচ্ছে সাহায্য। এটা থেকেই استغاثة গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে "সাহায্য চাওয়া"। ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি استغاثة শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে এরূপ লেখেছেন-

اَلْغَوْثُ : يُقَالُ فِي النُّصْرَةِ، وَالْغَيْثُ : فِي الْمَطَرِ، وَاسْتَغَثْتُهُ : طَلَبْتِ الْغَوْثُ أَوِ الْغَيْثُ.

'غـوث শব্দের অর্থ সাহায্য, غـيث শব্দের অর্থ বৃষ্টি এবং استغاثة অর্থ হচ্ছে কাউকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করা।'[১]

[১]. ইমাম রাগেব : মুফরাদাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৬১৭

استغاثة শব্দটি কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার হয়েছে। বদর যুদ্ধের ঘটনায় আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে সাহাবায়ে কেরামের ফরিয়াদের বর্ণনা সূরা আনফালে এভাবে করা হয়েছে-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴿٩﴾

"যখন তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কাছ থেকে (সাহায্যের জন্য) ফরিয়াদ করছিলে।"[২]

সৈয়্যদুনা মুসা আলাইহিস সালাম হতে তাঁর কওমের এক ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া এবং তাকে মুসা আলাইহিস সালামের সাহায্য করা- এ ঘটনাও কুরআন মজিদ استغاثة শব্দ দিয়েই উল্লেখ করেছেন। 'সূরা কসস' এ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴿١٥﴾

"সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর কওমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে মুসা'র শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির বিপরীতে মুসা'র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।"[৩]

অভিধানবিদগণের দৃষ্টিতে استغاثة ও استعانت শব্দ দু'টোই সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইসফাহানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি استعانت শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন-

وَالإِسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعَوْنِ.

'এস্তে'আনত অর্থ হচ্ছে সাহায্য প্রার্থনা করা।'[৪]

استعانت শব্দটিও কুরআন মজিদে সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ফাতেহাতে বান্দাদেরকে দোয়ার নিয়মাবলী শিক্ষা দিতে গিয়ে কুরআন মজিদ ফরমাচ্ছেন-

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

"এবং আমরা তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[৫]

[২]. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৯
[৩]. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ২৮
[৪]. ইমাম রাগেব : মুফরাদাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৫৯৮

এস্তেগাসা (استغاثة) এর প্রকারসমূহ

আরবের অভিধানবিদ এবং কুরআনের মুফাস্‌সিরগণের ব্যাখ্যানুযায়ী استغاثة অর্থ হচ্ছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা দুই প্রকার হতে পারে।

১. استغاثة بالقول কথার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা।

২. استغاثة بالفعل কর্মের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা।

কঠিন অবস্থায় ভীত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় মুখে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার করে কারো কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে একে استغاثة بالقول বলে আর সাহায্য প্রার্থনাকারী যদি নিজের অবস্থা, কর্ম এবং অবস্থার চাহিদার দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে একে استغاثة بالعمل বলা হবে।

কথার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা (استغاثة بالقول)

কুরআন মজিদে সৈয়্যদুনা মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার বরাতে استغاثة بالقول এর দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴿١٦٠﴾

"এবং আমি মুসা'র নিকট (এই) অহী প্রেরণ করলাম যখন তাঁর নিকট তাঁর কওমের লোকেরা পানি প্রার্থনা করল যে, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।"[৬]

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম এবং সৈয়্যদুনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে নবীয়ে আখেরুজ্জমান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর ধর্ম। 'তাওহীদ' (একত্ববাদ) এর আক্বীদা সকল নবীর শরীয়তে মৌলিক ও সমান গুরুত্ববহ। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তসহ সকল শরীয়তের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত প্রকৃত সাহায্যকারী কেউ নেই। অথচ এ আয়াতে মুবারকে সৈয়্যদুনা মুসা আলাইহিস সালামের নিকট থেকে পানির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। যদি এ

[৬]. আল-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৪
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৬০

কাজটি শিরক হত, তাহলে এই শিরকের চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ের উপর মু'জিযার ভিত্তি দেখানো হত না। কেননা ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, যখনই কোন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালামের নিকট তাওহীদের বিপরীত কোন কিছু দাবী করা হয়েছে, তখনই তাঁরা শিরকের সর্বপ্রকার পথ রুদ্ধ করার জন্য তা থেকে নিষেধ করেছেন। অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উপরোক্ত আয়াতে করিমাতে আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস সালামের কওমের এস্তেগাসার কারণে স্বয়ং সৈয়্যদুনা মুসা আলাইহিস সালামকে মু'জিযা প্রকাশ করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন। এর মর্মার্থ হল যে, প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী তো নিঃসন্দেহে আমিই, কিন্তু হে মুসা আলাইহিস্ সালাম! আমি মু'জিযা প্রকাশ করার জন্য আমার এখতিয়ারসমূহ (ইচ্ছার স্বাধীনতা) তোমাকে সমর্পণ করছি।

কর্মের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা (استغاثة بالعمل)

বিপদের সময় মুখ দিয়ে কোন প্রকার কথা বলা ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট কর্ম এবং অবস্থার চাহিদার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে استغاثة بالعمل। কুরআন মজিদে استغاثة بالعمل এর বৈধতা সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়ভাজন ও সম্মানিত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালামের ঘটনা বর্ণিত আছে। সৈয়্যদুনা ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের বিচ্ছেদের সময় তাঁর সম্মানিত পিতা সৈয়্যদুনা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের দৃষ্টিশক্তি অধিক ক্রন্দনের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যখন এ প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি তাঁর ব্যবহৃত জামা ভাইদের হাতে বুযর্গ পিতা সৈয়্যদুনা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের প্রতি সাহায্য চাওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন এবং ফরমালেন যে, এ জামাটি পিতা মহোদয়ের চক্ষুতে স্পর্শ করালে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। সুতরাং সেরূপই হল। এ ঘটনার বর্ণনা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কালামে মজিদে এভাবে করেছেন-

ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ﴿٩٣﴾

"আমার এই জামাটি নিয়ে যাও, এটাকে আমার পিতার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ (স্পর্শ) কর, তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবেন।"[৭]

[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৩

যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভাইয়েরা সেই জামাটি নিয়ে সৈয়্যদুনা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের চক্ষুদ্বয়ে স্পর্শ করলেন, তখন তিনি আল্লাহর হুকুমে তখনই দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়ে গেলেন। কুরআন মজিদে আছে-

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

"অতঃপর যখন সুসংবাদ শ্রবণকারী এসে পৌঁছলেন, তিনি সেই জামাটি ইয়াকুব এর মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করলেন, তখনই তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসল।"[৮]

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মহান পয়গাম্বর সৈয়্যদুনা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের আমল মুবারক, যা দ্বারা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল, কার্যত তাতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জামার এস্তেগাসা তথা সাহায্য প্রার্থনা বিদ্যমান। এটা কর্মগত এস্তেগাসা (استغاثه بالعمل) এর সর্বোত্তম কুরআনী দৃষ্টান্ত। যাতে সৈয়্যদুনা ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জামা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দৃষ্টিশক্তি অর্জন করার অসীলা বা মাধ্যম হল।

استغاثه ও توسل (সাহায্য প্রার্থনা ও অসীলা গ্রহণ) এর পারস্পরিক সম্পর্ক

استغاثه ও توسل এ দু'টি শব্দের অর্থ মূলত একটিই এবং উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্য শুধু কর্ম (فعل) এর সম্বন্ধতেই হয়ে থাকে। যখন فعل (কর্ম) এর সম্বন্ধ সাহায্য প্রার্থনাকারীর প্রতি করা হয়, তখন সেই ব্যক্তির এ কাজটিকে استغاثه বলা হবে এবং مستغاث مجاز (যার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে) 'অসীলা' ও 'মাধ্যম' হিসেবে স্থির হবে। কেননা مستغاث حقيقي (প্রকৃত সাহায্যকারী) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের আমলটি হচ্ছে এস্তেগাসা এবং জামাটি হচ্ছে 'অসীলা'। অপরদিকে যখন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করা হয়, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা (استغاثه) করা হয়, তাহলে যেহেতু আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবার থেকে উচ্চ কোন দরবার নেই, সেহেতু তা 'অসীলা' এর পরিবর্তে مستغاث حقيقي (প্রকৃত সাহায্যকারী) হিসেবে গণ্য হয়। সারকথা হচ্ছে যে, উপরোক্ত কুরআনী বর্ণনায়

[৮]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৬

استغاثه بالعمل সুন্নাতে আম্বিয়া দ্বারা প্রমাণিত। توسل এর আক্বীদা প্রসঙ্গে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য লেখকের কিতাব "قرآن وسنت اور عقيده توسل" দেখুন।

استغاثه এবং دعا এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

দুঃখ, ব্যথা এবং কষ্টের মধ্যে কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়াকে استغاثه বলা হয়। আর সাধারণভাবে আহবান করাকে দোয়া বলা হয়। তাতে দুঃখ, ব্যথা এবং কষ্টের শর্ত নেই। দোয়া ও এস্তেগাসার মধ্যে عموم وخصوص مطلق এর সম্বন্ধ বিদ্যমান। কেননা দোয়া সাধারণভাবে আহ্বান করাকে বলা হয়, অথচ استغاثه এর মধ্যে শর্ত রয়েছে যে, বিপদ কিংবা কষ্টের সময় আহ্বান করা হবে। এ কারণে সকল استغاثه তো দোয়াও হয়, কিন্তু সকল দোয়া استغاثه নয়। استغاثه ও দোয়ার মধ্যে এটাই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য।

আল্লাহ তা'আলার বাণীতে দোয়া শব্দের ব্যবহার

دعا، يدعو، دعوة এর অর্থ হচ্ছে ডাকা, আহ্বান করা। কুরআনে হাকীমে দোয়ার মূলাক্ষর বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিচে দোয়ার কুরআনী ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য তা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বর্ণনা করা হচ্ছে।

১. اَلنِّدَاءُ বা আহ্বান করা অর্থে

কুরআন মজিদে 'দোয়া' শব্দ সাধারণভাবে আহ্বান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কখনও দোয়া ও নেদা (نداء) একটি অপরটির স্থলেও ব্যবহার হয়েছে। উদাহারণ স্বরূপ কুরআন মজিদে রয়েছে-

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ﴿١٧١﴾

"এবং সেই কাফেরদের (হেদায়তের দিকে আহ্বান করার) উদাহারণ সেই ব্যক্তির মত, যে কোন এমন (প্রাণী) কে আহ্বান করে, যে আহ্বান এবং আওয়াজ ব্যতীত কিছুই শুনতে পায়না।"[৯]

[৯]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭১

২. اَلتَّسْمِيَةُ বা নামকরণ অর্থে

আরবি ভাষায় কোন কোন সময় দোয়া শব্দটি তাসমিয়া অর্থাৎ নাম রাখা কিংবা নাম ডাকা অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন- ইমাম রাগেব ইসফাহানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উদাহরণ পেশ করছেন-

دَعَوْتُ إِبْنِيْ زَيْدًا.

'আমি আমার পুত্রের নাম যায়েদ রেখেছি।'[১০]

এভাবে কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও সম্মানের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন-

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴿٦٣﴾

"(হে মুসলমানগণ!) তোমরা রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান করাকে পরস্পর একে অপরের (নাম নিয়ে) আহ্বান করার মত গণ্য করোনা।"[১১]

এ আয়াতে করীমাতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যে, তাজেদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও যেন তাঁর নাম মুবারক 'মুহাম্মদ' বলে আহ্বান না করি; বরং যখনই তাঁকে আহ্বান করা উদ্দেশ্য হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং 'ইয়া হাবীবাল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত উপাধিসমূহ দ্বারা আহ্বান করব। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র জগতের প্রতিপালক হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ কুরআন মজিদে কোন একটি স্থানেও সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইয়া মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে সম্বোধন করেননি।

৩. الإستغاثة বা সাহায্য চাওয়া অর্থে

দোয়া শব্দটি কুরআন মজিদের কোন কোন স্থানে চাওয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

[১০]. ইমাম রাগেব : মুফরাদাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৩১৫
[১১]. আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত : ১৭১

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴿٦٨﴾

"এবং তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট দোয়া করুন।"[১২]

৪. اَلْحَثُّ عَلَي الْقَصْدِ কোন জিনিসের ইচ্ছায় উৎসাহিত করা অর্থে

দোয়া শব্দের ব্যবহার কোন কোন সময় কোন জিনিসের ইচ্ছার প্রতি উৎসাহিত করা এবং অনুপ্রাণিত করার জন্যও করা হয়। কুরআন মজিদে এর উদাহরণ হচ্ছে এরূপ-

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ﴿٣٣﴾

"ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম (সকলের কথা শ্রবণ করে) আরয করলেন, হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের জন্য আহ্বান করছে, তার চেয়ে জেলখানা আমার নিকট অনেক বেশী ভাল।"[১৩]

আনন্দদায়ক জিনিসের প্রতি উৎসাহ প্রদানের অর্থে কুরআন মজিদে দোয়া শব্দের ব্যবহার সূরা ইউনুস এ এভাবে হয়েছে-

وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ ﴿٢٥﴾

"এবং আল্লাহ (মানুষকে) নিরাপদ গৃহ (জান্নাত) এর দিকে আহ্বান করছে।"[১৪]

৫. اَلطَّلَبُ চাওয়া অর্থে

আরবি ভাষায় طلب শব্দটি 'চাওয়া' অর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়। কুরআন মজিদে এর দৃষ্টান্ত এরূপ-

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

"এবং তোমাদের জন্য সে সব কিছু মওজুদ আছে, যা তোমরা চাইবে।"[১৫]

[১২]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৬৮
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৩৩
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৫
[১৫]. আল-কুরআন, সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩১

৬. اَلدُّعَاءُ প্রার্থনা অর্থে

দোয়া শব্দটি কখনও আল্লাহ্ রাব্বুল উজ্জতের কাছে কৃত প্রার্থনা (দোয়া) অর্থেও ব্যবহার হয়। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'আলার বুযর্গ বান্দাদের দোয়া এভাবে বর্ণিত আছে-

وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

"এবং তাঁদের দোয়া (এ বাক্যের উপর) সমাপ্ত হবে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই যিনি জগতসমূহের পালনকর্তা।"[১৬]

৭. اَلْعِبَادَةُ ইবাদত অর্থে

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতকেও দোয়া বলা হয়। যেমন- তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঘোষণা হচ্ছে-

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

"দোয়াই হচ্ছে ইবাদত।"[১৭]

৮. اَلْخِطَابُ সম্বোধন অর্থে

দোয়া শব্দের উপরোক্ত প্রকারগুলো ব্যতীত কখনও একে সাধারণভাবে সম্বোধন অর্থের জন্যও ব্যবহার করা হয়। উহুদ যুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধ চলাকালে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইনের কদম বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা ছড়িয়ে গিয়ে যুদ্ধ করছিলেন, শুধু একটি ক্ষুদ্র দল তাজেদারে খতমে নবুওয়াত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে রয়ে গিয়েছিল। তখন সেই মুহূর্তে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নিজের নিকট আহ্বান করলেন। মাহবূবে কিবরিয়ার এ রহমতপূর্ণ সম্বোধনকে কুরআন মজিদ এভাবে বর্ণনা করছেন-

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ ﴿١٥٣﴾

[১৬]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ১০
[১৭]. তিরমিযী : আস সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, ২/১৭৩

"যখন তোমরা (বিচ্ছিন্ন হয়ে) পালিয়ে যাচ্ছিলে ও কারো প্রতি ঘুরে দেখছিলেনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দলে (দণ্ডায়মান) যা তোমাদের পিছনে (দৃঢ়পদ) রয়েছিল তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন।"[১৮]

এ আয়াতে করীমাতে উল্লেখিত يَدْعُوكُمْ শব্দের অর্থ- "রাসূল তোমাদেরকে সম্বোধন করছিলেন" 'ইবাদতের দোয়া হিসেবে কখনও সাব্যস্ত করা যাবেনা। কেননা রাসূলের শানে (মা আযাল্লাহ) শিরকের মধ্যে বিন্দুমাত্র লিপ্ত হবার ধারণাও সম্ভব নয়।

দোয়ার মনগড়া প্রকার

কুরআন মজিদে ব্যবহৃত দোয়ার প্রকারসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার পর এখন আমরা এ বিষয়ের অবতারণা করছি যে, কিছু লোক এস্তেগাসা ও তাওয়াসসুলকে শরিয়ত পরিপন্থী সাব্যস্ত করার জন্য দোয়ার একটি মনগড়া প্রকারভেদ করে থাকে, অথচ তাদের কাছে এস্তেগাসা নিষেধ হবার উপর কুরআন মজিদের একটি আয়াতও দলীল হিসেবে বিদ্যমান নেই। তাদের সমস্ত মনগড়া বিষয়ের ভিত্তি হচ্ছে বিবেকপ্রসূত সুক্ষ্মদৃষ্টি যা স্বয়ং অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের দ্বারা গঠিত। এস্তেগাসাকে শিরক সাব্যস্ত করার জন্য প্রথমে একে দোয়ার অর্থে গ্রহণ করা হয় এবং তারপর দোয়ার দুটো মনগড়া প্রকার করে দেওয়া হয় :

১. دعائے عبادت বা ইবাদতের দোয়া।
২. دعائے سوال বা সাহায্য চাওয়ার দোয়া।

১. ইবাদতের দোয়া

দোয়ার প্রথম প্রকার হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের সকল ইবাদত বিভিন্ন প্রকারের দোয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

"দোয়া ইবাদতের সার (মগজ)।"[১৯]

জামে তিরমিযীতেই বর্ণিত অন্য একটি হাদিস শরীফে দোয়াকে স্বয়ং ইবাদত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

[১৮]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৩
[১৯]. তিরমিযী : আস সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, ২/১৭৩

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

"দোয়াই হচ্ছে ইবাদত।"[২০]

ইবাদত শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের জন্যই বৈধ। সুতরাং তাদের ধারণা হল এ অর্থের দিক থেকে গাইরুল্লাহর কাছে কৃত দোয়া তার ইবাদত সাব্যস্ত হবার কারণে শিরকের মধ্যে গণ্য হল।

২. চাওয়ার জন্য দোয়া

কারো কাছে কিছু চাওয়া, কাউকে বিপদ দূরকারী মেনে নেওয়া এবং তার সম্মুখে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করাকে 'চাওয়ার দোয়া' বলা হয়।

এ স্থানে এ অভিযোগ করা হয় যে, বিপদ দূরকারী যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সেহেতু কোন কিছু তাঁর কাছেই চাইতে পারবে। ভিক্ষুকের চাওয়াটা যেহেতু তার দাসত্বের স্বীকৃতি হয়, এজন্য গাইরুল্লাহ্র কাছে চাওয়াটা তার বান্দা হওয়ার সমার্থক এবং তা শিরক। এজন্য বলা যেতে পারে যে, سَائِلٌ مِنْ دُوْنِ اللهِ (যে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের কাছে কিছু চায়) মুশরিক।

প্রকারের উপকারিতা বৈপরিত্য এখানে অনুপস্থিত

দোয়ার উপরোক্ত প্রকর 'এস্তেগাসা' বৈধ হওয়া এবং না হওয়ার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এস্তেগাসা অবৈধ হবার প্রবক্তা দলের জন্যও অপ্রয়োজনীয়। কেননা ইবাদতের দোয়া ও চাওয়ার দোয়াকে একই অর্থ দিয়ে প্রকারভেদের উপকারিতাকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে দোয়ায়ে সওয়ালকেও দোয়ায়ে ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যখন দোয়ায়ে ইবাদত গাইরুল্লাহর জন্য বৈধ নয় এবং দোয়ায়ে সওয়ালও গাইরুল্লাহ্র কাছে করা শিরক স্থির হল, তাহরে দোয়ার এই দু'প্রকারের মধ্যে কি পার্থক্য থাকল? প্রকৃতপক্ষে এই প্রকরণের মোটেই কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রকারভেদের উপকারিতা তো তখনই সাব্যস্ত হত, যখন উভয় প্রকারের বেলায় ভিন্ন রকম আহ্কাম সাব্যস্ত হত। যে কোন প্রকরণের অধীন প্রকারগুলো যদি নিজস্ব পৃথক পৃথক বিধান না রাখে, তাহলে এরূপ প্রকরণ অর্থহীন থেকে যায়। এ কথাটিকে আমরা একটি সহজ উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিচ্ছি।

[২০] তিরমিযী: আস সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, ২/১৭৩

প্রথম উদাহরণ

সিজদার দুটো প্রকার রয়েছে। ১. সিজদায়ে ইবাদত (ইবাদতের সিজদা)। ২. সিজদায়ে তা'যীম (সম্মানার্থে সিজদা)।

সিজদার এ দু'প্রকারের মধ্যে তা'যীমী সিজদা ইবাদতের সিজদার অন্তর্ভুক্ত হয় না। যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা বাতেল বলে গণ্য হবে। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে হুকুমের দিক থেকেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। যদি কোন বান্দার সম্মুখে ইবাদতের নিয়তে সিজদা করা হয়, তাহলে তা শিরকের মধ্যে গণ্য হবে আর যদি শুধু সম্মানের খাতিরে সিজদা করা হয়, তা শিরক সাব্যস্ত হবে না; বরং এ কাজের উপর হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ

এভাবে আরও একটি উদাহরণ দেখুন- كلمة এর তিনটি প্রকার রয়েছে। اسم - فعل - حرف। এ তিনটিতে পরস্পর বৈপরিত্য বিদ্যমান। এগুলোর পরস্পরকে সংযুক্ত করা কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ হতে পারে না।

দোয়া অর্থ শুধু ইবাদত না হওয়ার বর্ণনা

এখন যদি দোয়া শব্দটি শুধু দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তাও নিশ্চয় বিশুদ্ধ নয়। কেননা দোয়া শব্দের আটটি অর্থ আপনারা ইতিপূর্বে বিস্তারিত পাঠ করেছেন। যদি দোয়া দ্বারা শুধু ইবাদত উদ্দেশ্য করা হয় এবং দোয়ায়ে সওয়ালকেও দোয়ায়ে ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে তো সমগ্র জীবনযাপন শিরকের কাদায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামও এ কাদা থেকে রক্ষা পাবেন না। প্রকাশ থাকে যে, দোয়া (আহ্বান করা) সব জায়গায় ইবাদতের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অন্যথায় শিরকের অপবিত্রতা থেকে কারো পবিত্র থাকা দৃষ্টিগোচর হয়না। কেননা স্বয়ং কুরআনের নস্ (দলীল) এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গাইরুল্লাহকে আহ্বান করেছেন এবং স্বয়ং কুরআনে করিম পরস্পরের মধ্যে একজন অপরজনকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করার অনুমতি দিচ্ছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সকল স্থানে دعا - يدعو - تدعو - ندعوا এর অর্থ শুধু দোয়া এ ইবাদত বা দোয়ায়ে সওয়ালই (যা অনেকের মতে, ইবাদতেরই একটি অধীনস্ত প্রকার) সাব্যস্ত করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে কি ব্যাখ্যা পেশ করা হবে-

1- وَيَٰقَوۡمِ مَا لِيٓ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدۡعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿٤١﴾

"হে আমার কওম! এটা কি রকম কথা যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির (পথ) দিকে আহ্বান করছি এবং তোমরা আমাকে দোযখের দিকে আহ্বান করছ।"[২১]

2- قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَيۡلٗا وَنَهَارٗا ﴿٥﴾ فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارٗا ﴿٦﴾

"তিনি আরয করলেন, হে আমার রব! আমি রাত দিন স্বীয় কওমের লোকদেরকে (সত্য দ্বীনের প্রতি) আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বানের পর তারা (দ্বীন থেকে) আরও অধিক পালিয়ে যাচ্ছে।"[২২]

وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ ﴿٢٥﴾

"এবং আল্লাহ্ নিরাপত্তার গৃহের (জান্নাত) প্রতি আহ্বান করছেন।"[২৩]

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴿٥﴾

"তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়েই ডাকো; এটা আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সংগত।"[২৪]

فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٧﴾ سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

"অতঃপর তারা তাদের সাথীদেরকে (সাহায্যের জন্য) আহ্বান করুক। আমি ও অতিসত্বর (স্বীয়) সৈন্যদেরকে আহ্বান করব।"[২৫]

فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ ﴿٥٢﴾

"তখন তারা তাদেরকে আহ্বান করবে। তারা তাদেরকে জবাব দেবে না।"[২৬]

يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۭ بِإِمَٰمِهِمۡ ﴿٧١﴾

[২১]. আল-কুরআন, সূরা মু'মিন, আয়াত : ৪১
[২২]. আল-কুরআন, সূরা নূহ, আয়াত : ৫-৬
[২৩]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৫
[২৪]. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ৫
[২৫]. আল-কুরআন, সূরা আলাক, আয়াত : ১৭-১৮
[২৬]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫২

"যখন আমি মানুষের প্রত্যেক স্তরকে তাদের ইমাম সহকারে আহ্বান করবো।"[২৭]

وَإِن تَدۡعُهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ ﴿٥٧﴾

"আর যদি আপনি তাদেরকে হিদায়তের প্রতি আহ্বান করেন।"[২৮]

সূরা ফাতিহা এবং এস্তেআনাত ও এস্তেগাসার ধারণা

সূরা ফাতিহাতে যেখানে ইসলামের অনেক আকাঈদ ও শিক্ষার ধারণাকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে, সেখানে এস্তেগাসার বা সাহায্য প্রার্থনার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন-

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ﴿٥﴾

"হে আল্লাহ্, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"[২৯]

এ পবিত্র আয়াতটিই এস্তেআনাত ও এস্তেগাসার ভিত্তি, যাতে ইবাদত ও এস্তেআনাত (সাহায্য প্রার্থনা)কে একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে করিমাটির প্রথম অংশ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ ইসলামে ইবাদতের ধারণাকে অন্তর্ভুক্তকারী এবং দ্বিতীয় অংশ إِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ এস্তেআনাত এর ধারণাকে সুস্পষ্ট করছে। এটি সেই আয়াত মুবারক যা বাহ্যিকভাবে অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত বাতিল গবেষণার মাধ্যমে কিছু লোক সকল মুসলিম উম্মতের উপর শিরকের ফতোয়া দেওয়া আরম্ভ করে।

মূলত এ আয়াতকে হালকাভাবে অধ্যয়ন করে তাদের মাথায় এ ধারণার উল্লেখ হয় যে, আয়াতের দুটো অংশই একই বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথম অংশে ইবাদতের উল্লেখ আছে, যা শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় অংশে এস্তেআনাত (সাহায্য চাওয়া) এর উল্লেখ রয়েছে। একই রকম শব্দের ব্যবহারের কারণে, একই বিধান অর্জিত হওয়া, একটি স্বাভাবিক বিষয়। এভাবে সেই লোকেরা এই সরাসরি দলীল গ্রহণের মাধ্যমে ধোকা খেয়ে যায়

[২৭]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭১
[২৮]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫৭
[২৯]. আল-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৫

এবং এস্তেআনাত-এস্তেগাসাকেও ইবাদতের মত শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সাথে নির্দিষ্ট গণ্য করতে থাকে।

যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে এ আয়াতে করিমাটি অধ্যয়ন করি তখন একেবারে ভিন্ন অবস্থা দেখতে পাই। একই রকম শব্দ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আয়াতের দুটি অংশের মধ্যখানে হরফে আত্‌ফ ওয়াও (واو) আসাও কোন রহস্যের ইঙ্গিতবহ! যদি ইবাদত ও এস্তেআনাতের হুকুম একই হত, তাহলে এ দুটো বাক্যের মধ্যখানে আল্লাহ তা'আলা কখনও 'ওয়াও' বৃদ্ধি করতেন না। এই 'ওয়াও' অক্ষর লওয়ার দ্বারাই পূর্বের ও পরের মধ্যখানে বৈপরিত্য প্রকাশ পাচ্ছে। দুই বাক্যের মধ্যখানের বৈপরীতার্থক অক্ষরের কারণে দুইটি বাক্যের বিধান পৃথক হয়ে যায়। যদি إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এ সাহায্য চাওয়ার অর্থ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হত, তাহলে কুরআন মজিদ একে 'সম্বন্ধবাচক ওয়াও' অক্ষর দ্বারা إِيَّاكَ نَعْبُدُ হতে পৃথক করতেন না। বৈপরীতার্থক হরফ 'ওয়াও' এর ব্যবহার একথা বলে দিচ্ছে যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ এবং إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দুটোর পৃথক পৃথক বাস্তবতা (হাকীকত) বিদ্যমান। যদি ইবাদত ও এস্তেআনাত এর আহকাম একই হত, তাহলে এ দুটোর মধ্যখানে বৈপরীতার্থক হরফ 'ওয়াও আতেফা' (واوعاطفه) লওয়ার প্রয়োজন হত না; বরং বাক্যটি এভাবে হতো إِيَّاكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ نَسْتَعِينُ। কুরআন মজিদ মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার কারণে স্বীয় পরিপূর্ণতায় সকল মানবীয় ত্রুটির উর্ধ্বে, উহার রচনার সৌন্দর্য হচ্ছে উহার প্রতিটি অক্ষরের নিজস্ব নির্দিষ্ট অর্থ ও মর্ম বিদ্যমান এবং উহার কোন একটি অক্ষরও অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা যায় না। যদি এ স্থানে ইবাদত ও এস্তেআনতের মধ্যে বৈপরিত্যের বর্ণনা উদ্দেশ্য না হত, তাহলে বিপরীতার্থক হরফ কখনও আনা হত না। কুরআন মজিদে এর সমর্থনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। তেমনিভাবে যেখানে বৈপরিত্য উদ্দেশ্য নয়, সেখানে বৈপরিত্যের জন্য নেওয়ার জন্য বিপরীতার্থক হরফ ব্যবহৃত না হবার দৃষ্টান্ত 'সূরা ফাতেহা'রই প্রারম্ভিক তিনটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে ইরশাদ হচ্ছে-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অত্যন্ত দয়ালু। বিচার দিনের মালিক, (হে আল্লাহ্) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"[৩০]

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, ধারাবাহিক তিনটি প্রারম্ভিক আয়াতেই আল্লাহর নামের পর ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তা'আলার চারটি গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন প্রকার বৈপরিত্য না থাকার কারণে কোথাও সম্বন্ধবাচক 'ওয়াও' (واو) নেওয়া হয়নি। অথচ এর সম্মুখের আয়াতে যেখানে ভিন্ন ও বিপরীত আমল ও কর্মের উল্লেখ উদ্দেশ্য, যেখানে বৈপরিত্যের জন্য 'সম্বন্ধবাচক ওয়াও' নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা থেকে বুঝা গেল যে, দোয়া এবং এস্তেআনত ও এস্তেগাসা (সাহায্য চাওয়া) দুটো ভিন্ন জিনিস এবং এগুলোর মধ্যে সংযুক্ত ও সংমিশ্রিত করার চেষ্টা করা কুরআন নাযিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ, যা কখনও দুরস্ত নয়। অপূর্ণাঙ্গ বিবেকের উপর পরিপূর্ণ সীমাবদ্ধতা ভ্রষ্টতার জন্ম দেয় এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিপ্ত হয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে থেকে যায়। অন্য লোকদেরকেও বুদ্ধির ঘোড়ার রিযক বানিয়ে এবং নিজের বুদ্ধিকেও ভুল চিন্তার বাহক বানিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের অনর্থক জগত সৃষ্টি করে থাকে।

৩০. আল-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ১-৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাজেদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা বা সাহায্য চাওয়ার অর্থ

বিশুদ্ধ ইসামী আকীদা অনুযায়ী এস্তেআনাত, এস্তেমদাদ, এস্তেগাসা, সওয়াল, অন্বেষণ, আহ্বানে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের সত্তাই সাহায্যকারী ও সহায়তাকারী। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অনেকবার ইরশাদ করেছেন যে, "তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদেরকে দান করব।"

অতঃপর যদি কোন ব্যক্তি কুরআন মজিদের এই মৌলিক শিক্ষা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এই আকীদা পোষণ করে যে, এস্তেগাসা, এস্তেআনাত, আহ্বান ও অন্বেষণে কোন মানুষ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের অনুমতি ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং লাভ-ক্ষতি করতে সক্ষম, তাহলে তা নিশ্চিতভাবে শিরক্, চাই সেই সাহায্য চাওয়াটা আলমে আসবাবের অধীনে হোক কিংবা আসবাবের উর্ধ্বে হোক। উভয় অবস্থায় এরূপ ব্যক্তি মুশরিক বলে গণ্য হবে। যখন এর বিপরীত অবস্থায় যদি প্রকৃত সাহায্যকারী ও সাড়াদানকারী আল্লাহ্ তা'আলাকে মনে করে বান্দা রূপকভাবে কোন কাজের জন্য অন্য কোন বান্দার প্রতি ধাবিত হয়। যেমন- ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করায় বা দম দরূদ ও দোয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কোন নেক ও সৎবান্দার কাছে যায়, তাহলে তা অবশ্যই শিরক নয়; বরং তার এ কাজটি সামাজিক চুক্তির অধীনে আসবাব বা মাধ্যম গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামে মজিদে বারবার মু'মিনদেরকে পরস্পর সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"এবং নেকী ও খোদাভীতি'র (কার্যাবলি) ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য কর এবং গুনাহ ও অত্যাচার (এর কাজে) একে অপরের সাহায্য করো না।"[৩১]

উপরোক্ত আয়াতে করিমায় আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানকে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। একথা সুস্পষ্ট যে, একে অপরকে সাহায্য তখনই সম্ভব যখন কোন দুর্বল অবস্থার মু'মিন সচ্ছল অবস্থার মু'মিনের কাছে সাহায্য চায়। প্রকাশ থাকে যে, এই সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া মূল

[৩১]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ২

মু'য়ামালাতেও খোদায়ী হুকুমের অধীন এবং রূহানী মু'য়ামালাতেও। অনুরূপভাবে আসবাবের অধীন মুয়ামালাও এতে অন্তর্ভুক্ত এবং আসবাবের অমুখাপেক্ষী মুয়ামালাও এতে শামিল। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত 'তাআউন' (পরস্পর সহযোগিতার নীতিমালা)'র নির্দেশ অনির্দিষ্টভাবে দিয়েছেন। আর নিয়ম হচ্ছে কুরআন মজিদের অনির্দিষ্ট বিধান (مطلق) কে কোন খবরে ওয়াহেদ কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যাবেনা। এ ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি এই 'সহযোগিতা' (تعاون) [Mutual Cooperation] কে আসবাব এর শর্তে নির্দিষ্ট করতে চাইলে, অবশ্যই খোদায়ী উদ্দেশ্যের বিপরীত কর্মে লিপ্ত বলে ধারণা হবে। ইসলামী আহকাম ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একে অপরকে সাহায্যে অগ্রসর হবার বিধান আয়াতে করিমা ও হাদিস শরীফে অসংখ্য স্থানে রয়েছে। যেগুলো দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তার উচিত হচ্ছে যেন সাহায্য করে, যার কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয় সে যেন সহযোগিতা করতে পৌঁছে এবং যাকে আহ্বান করা হয়, সে যেন আহ্বানে সাড়া দেয় ও দুঃখী মানবতার কাজে আসে।

এস্তেগাসা'র বৈধতায় অসংখ্য স্থানে কুরআনের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা সেরূপ বৈধ যেরূপ সৈয়্যদুনা মুসা আলাইহিস্সালামের কাছে একজন কিবতী এক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এস্তেগাসা করেছিলেন, তখন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের চেয়ে অধিক একত্ববাদী কে হতে পারে? যাদের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল তাওহীদের পয়গামকে সমগ্র জগতে প্রচার করা। আল্লাহ্ তা'আলা কিবতী ও নবী দু'জনের একজনকেও এস্তেগাসা'র কাজ সম্পাদনের কারণে মুশরিক সাব্যস্ত করেননি। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন-

فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ

"সুতরাং যে ব্যক্তি তার কওমের ছিল সে অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে মুসা'র শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, মুসা'র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।"[৩২]

[৩২]. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ১৫

কুরআন মজিদে এটা ব্যতীত আরও অনেক স্থানে পূর্ববর্তী উম্মতের মু'মিনগণ কর্তৃক নিজেদের নবীগণ এবং নেককার উম্মত হতে এস্তেগাসা করার বর্ণনা এসেছে। প্রিয়নবীর উম্মতেও এই বিধান বিদ্যমান এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক এর উপর আমল চালু রয়েছে। অসংখ্য হাদিস মুবারকে দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং একে অপরের দুঃখ দুর্দশা দূর করার বর্ণনা রয়েছে।

এস্তেগাসা : হাদিস শরীফ ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের আলোকে

দুর্দশাগ্রস্ত মুহূর্তে কারো আশ্রয়স্থল হওয়া এবং বিপদের সময় কারো দুঃখে শরিক হওয়া ভালবাসার রীতিনীতির মজবুত ভিত্তি। ইসলামের পয়গাম হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম এবং তাজেদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হায়াতের প্রত্যেকটি মুহূর্ত মুহাব্বতের সুবাশে সুশোভিত। তায়েফের অসৎ ছেলেদের পাথর নিক্ষেপের সময়ও পবিত্র ওষ্ঠ মোবারক হতে দোয়ার ফুল ফুটেছে। তিনি রক্ত পিপাসুদের মধ্যে দয়া বন্টনকারী এবং ক্ষমা ও বদান্যতার মুক্তা বিতরণকারী আক্বায়ে কায়েনাতের দ্বীন মূলত মুহাব্বতের ব্যাখ্যার নাম। দুঃখ দুর্দশা বিদুরীত করার এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বড় অসীলা ও মাধ্যম কি আর কেউ হতে পারে! কিয়ামতের দিন যখন মানুষের উপর কালের সবচেয়ে বড় বিপদ আপতিত হবে, সকলেই নফ্সী নফ্সী (আমাকে রক্ষা কর) আহ্বান করতে থাকবে, লোকেরা আম্বিয়া ও নেক্কারদের কাছে এস্তেগাসা ও শাফায়াত অন্বেষণের লক্ষ্যে উপস্থিত হবে, কিন্তু সেদিন সকল নবী আলায়হিমুস সালাম অস্বীকার করে চলে যাবে। এভাবে শেষে লোকেরা সরওয়ারে কায়েনাতকে অসীলা বানিয়ে এস্তেগাসা করবে। যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় সেই সময়ের বিপদকে দূর করে দেবেন। হাদিস শরীফে তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, লোকেরা সৈয়্যদুনা আদম আলাইহিস সালামের নিকট 'এস্তেগাসা' করবে, তারপর সৈয়্যদুনা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এবং এরপর খাতেমুল মুরসালীন সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা করবে। হাদিসের ভাষ্য এরূপ–

اِسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ

"লোকেরা আদম আলাইহিস্ সালামের কাছে এস্তেগাসা করবে, তারপর মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এবং পরিশেষে (তাজেদারে আম্বিয়া) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা করবে।"[৩৩]

সহীহ বুখারীতে استغاثه শব্দ সহকারে এ হাদিস মুবারকের বর্ণনা দ্বারা استغاثه শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক সালেহীন ও নবীগণের কাছে এস্তেগাসা করার বৈধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, যেই এস্তেগাসা করার পরকালীন জীবনে অনুমতি আছে এবং যেই এস্তেগাসা ও এস্তেআনত (সাহায্য চাওয়া) বর্তমান পার্থিব জীবনে জীবিত ব্যক্তিদের কাছে করা বৈধ- কবর জগতে সেই এস্তেগাসার বৈধতার উপর শিরকের অপবাদ দেওয়ার কি অর্থ হতে পারে?

হাদিস শরীফের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহুম খাতেমুন্নবীয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা ও এস্তেমদাদ করতেন। নিজেদের দারিদ্রতা, রোগ, বিপদ, হাজত, ঋণ ও অক্ষমতা ইত্যাদি অবস্থাদি বর্ণনা করে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসীলা মেনে জীবনের এ সকল সমস্যার সমাধান চাইতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের সুপ্ত আক্বীদা এটা ছিল যে, সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একজন মাধ্যম আর লাভক্ষতির কারণ (সবব) এবং প্রকৃত কর্মসম্পদনকারী তো শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সত্তাই।

আমরা উদাহারণস্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদিস মুবারকের উল্লেখ করছি, যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন হুযুর সরওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা করেছেন।

সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এস্তেগাসা

সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্মরণশক্তি প্রথমে অত্যন্ত কম ছিল এবং তিনি সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী সমূহ মুখস্থ রাখতে পারছিলেন না। তিনি হুযুর রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে এস্তেগাসা ও অনুনয় করলেন। এতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিস্তারিত অভিযোগ চিরদিনের

[৩৩]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯৯, হাদীস : ১৩৮১

জন্য দূর করে দিলেন। এ কারণেই তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হয়েছেন। সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাঁর ঘটনা স্বয়ং বর্ণনা করছেন-

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

"আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার অনেক হাদিস শুনে থাকি এবং পরে তা ভুলে যাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার চাদর প্রসারিত কর। তখন আমি তা প্রসারিত করলাম। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাচ্ছেন, অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শূন্য হতে) স্বীয় হাত মুবারক দ্বারা কিছু জিনিস নিয়ে তাতে (চাদর) দিলেন। তারপর ফরমালেন, এটাকে তোমার সাথে মিলিয়ে নাও এবং এরপর আমি কখনও কোন কিছু ভুলে যাইনি।"[৩৪]

সহীহ বুখারীর বর্ণিত হাদিস মুবারক থেকে একথা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সকল সমস্যার সমাধান লাভের জন্য এস্তেগাসা করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের চেয়ে বড় একত্ববাদী আর কে হতে পারে। এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বড় তাওহীদের প্রতি আহ্বানকারী আর কে গণ্য হতে পারেন! অথচ এতদসত্ত্বেও সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি না করে তাঁর সমস্যা সারা জীবনের জন্য সমাধান করে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, সকল একত্ববাদী লোক এটা জানেন যে, প্রকৃত সাহায্যকারী শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সত্তা, আম্বিয়া, আউলিয়া, সালেহীন এবং উম্মতের নেককার ব্যক্তি, যাদের কাছ থেকে সাহায্য অন্বেষণ করা যায়, তাঁরা তো সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু সবব এবং মাধ্যম। তাঁদের ক্ষমতাপ্রয়োগ শুধু আল্লাহ্

[৩৪] বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ইলম, ১/১৯৯, হাদীস : ১১৬, কিতাবুস সওম, ১/২৭৪, হাদীস : ৩৩৭৫

তা'আলার বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে তাঁরা মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া কবুলের মাধ্যম ও অসীলা হয়।

সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা করেছেন, এবং সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাজত পূর্ণ করে দিয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এটা বলেননি যে, যাও, আল্লাহর কাছে দোয়া কর এবং তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শূণ্য থেকে অদেখা বস্তু মুষ্টি ভরে নিয়ে তার চাদর দিলেন আর বললেন, তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে নাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাজত পূর্ণ করার জন্য এ আমলকে অসীলা স্বরূপ কবুল করে নিলেন।

সকল জ্ঞানবান একত্ববাদী এটা অবগত আছে যে, হাজত পূর্ণ হওয়া এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দোয়া ও সাহায্য শুধু তাঁর কাছেই চাওয়া হয়, যাঁর কুদরতী কব্জায় বিশ্বের সকল এখতিয়ার রয়েছে। অসীলা অন্বেষণকারীর উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি অসীলা হন ও সুপারিশ করেন, তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে আমি গুনাহগারের চেয়ে অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং তাঁর মর্তবা এস্তেগাসাকারীর চেয়ে আল্লাহর দরবারে অধিক। সাহায্যপ্রার্থী তাকে রূপক সাহায্যকারীর চাইতে অধিক মনে করেন না। কেননা সে একথা অবগত আছে যে, প্রকৃত সাহায্যকারী শুধু আল্লাহ তা'আলার সত্তা। এ বিষয়টিই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস হতে সুস্পষ্ট হচ্ছে।

সৈয়্যদুনা কাদাতাহ ইবনে নূ'মান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এস্তেগাসা

সৈয়্যদুনা কাতাদাহ ইবনে নূ'মান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু মোবারক গযওয়ায়ে বদরের সময়কালে অন্ধ হয়ে গেল এবং চক্ষুর পুতলি স্বস্থান থেকে বের হয়ে মুখমণ্ডলের বাইরে লটকে গেল। কষ্টের আধিক্যের কথা বিবেচনা করে কয়েকজন সাহাবা পরামর্শ দিলেন যে, নাকি চোখের রগ কেটে দেওয়া হবে, যাতে কষ্ট কিছু হ্রাস পায়। হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথীদের পরামর্শে আমল করার আগে মুহসিনে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অবস্থা বর্ণনা ও অনুনয় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। সরওয়ারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে যখন দুঃখের কথা শুনালেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান

দরবারে এস্তেআনত হয়ে যখন দুঃখের কথা শুনালেন, তখন হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চক্ষু কাটার অনুমতি দানের স্থলে স্বীয় মোবারক হাত দ্বারা চক্ষুকে পুনরায় উহার স্থানে রেখে দিলেন। এতে তাঁর দৃষ্টি পুনরায় ফিরে আসল। হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে, আমার বিনষ্ট চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি কোনভাবেই আগের চক্ষুর চেয়ে কম নয়, বরং আগের চেয়েও উত্তম। এই এস্তেগাসার হাদিসটি ইমাম বায়হাকী 'দালায়িলুন নুবুওয়াহ' গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ﷺ أَنَّهُ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَسَأَلَتْ حَدَقَتُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ، فَأَرَادُوْا أَنْ يَقْطَعُوْهَا فَسَأَلُوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : لاَ ، فَدَعَا بِهِ فَغَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ ، فَكَانَ لاَ يَدْرِيْ أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ ؟

"সৈয়্যদুনা কাদাতাহ ইবনে নু'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর চক্ষু বদর যুদ্ধ চলাকালে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং চোখের মণি বের হয়ে মুখমণ্ডলে এসে গিয়েছিল। অন্যান্য সাহাবাগণ সেটা কেটে দিতে চাইল। যখন রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন এবং চক্ষুকে পুনরায় উহার স্থানে প্রতিস্থাপন করলেন। এতে হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেল যে, তিনি বুঝতে পারতেন না যে, কোন চক্ষুটি নষ্ট হয়েছিল।"[৩৫]

ফোঁড়া আক্রান্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এস্তেগাসা

হাদিসের গ্রন্থাবলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন ফোঁড়া আক্রান্ত সাহাবীর এস্তেগাসা'র কথা বর্ণিত আছে। একজন সাহাবীর হাতে ফোঁড়া (Struma) ছিল। যার কারণে জিহাদ চলাকালে ঘোড়ার লাগাম কিংবা তলোয়ারের হাতল ধরা তাঁর জন্য সম্ভব ছিল

[৩৫]. ১. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, হাদীস : ১২০৩
২. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, হাদীস : ১০০৩
৩. ইবনে সা'আদ : তাবকাতুল কুবরা, হাদীস : ১৮৭১
৪. ইবনে কাসীর : আত তারীখ, ৩/২৯১
৫. আসকালানী : আল ইসাবা, ৩/২২৫

না। সেই সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন এবং এ রোগের চিকিৎসার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাইলেন। অতঃপর প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকের মাধ্যমে সেই সাহাবীকে শেফা দান করলেন। এ হাদিস মুবারকটি মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে-

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبِكَفِّيَّ سَلْعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ السَّلْعَةُ قَدْ أورمتْنِي، لتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَائِمَةِ السَّيْفِ أَنْ أَقْبِضَ عَلَيْهِ، وَعَنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أُدْنُ مِنِّي، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَفَتَحْتُهَا، فَنَفَثَ فِي كَفِّي، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى السَّلْعَةِ، فَمَا زَالَ يَطْحَنُهَا بِكَفِّهِ حَتَّى رَفَعَ عَنْهَا، وَمَا أَرَى أَثَرَهَا.

"আমি রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমার হাতে একটি ফোঁড়া ছিল। আমি আরয করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার হাতে) ফোঁড়া রয়েছে। যার কারণে বাহনের লাগাম ও তলোয়ার ধরতে আমার কষ্ট হয়।" নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "আমার কাছে আস।" তখন আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ফোঁড়াকে খুললেন এবং আমার হাতে ফুঁ দিলেন ও স্বীয় হাত মুবারক আমার ফোঁড়ার উপর রেখে চাপ দিতে লাগলেন। অবশেষে যখন হাত তুললেন, তখন উহার (ফোঁড়া) চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে গেল।[৩৬]

অন্ধ সাহাবীর এস্তেগাসা

মাতৃগর্ভ অন্ধদেরকে দৃষ্টিশক্তির নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের মু'জিযা ছিল। সাথে সাথে তা তাজেদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও মু'জিযা ছিল। বর্ণিত আছে যে, একজন অন্ধ সাহাবী সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবি

[৩৬]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৬/৪৬৮, হাদীস : ৭০৬৫
২. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/২৯৮

খেদমতে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার জন্য এস্তেগাসা করতে আসেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিষেধ করা ও এস্তেগাসা হারাম হওয়া কিংবা এতে শিরকের আশংকা প্রকাশ করার পরিবর্তে স্বয়ং তাঁকে দোয়া শিক্ষা দিলেন। এ দোয়াতে তাঁর নিজ সত্তার অসীলা ও এস্তেগাসা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তা সেই অন্ধ সাহাবীর মত নিষ্ঠার সাথে আজও দুঃখী মানুষের জন্য দোয়া করার পরীক্ষিত আমল। বর্ণিত দোয়াটি নিম্নরূপ-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান অসীলায় মনোনিবেশ হচ্ছি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার অসীলায় আপনার রবের প্রতি নত হচ্ছি যেন আমার এই হাজত পূর্ণ হয়। হে আমার আল্লাহ্! আমার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ ও শাফায়াতকে কবুল করে নাও।"[৩৭]

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, এ হাদিস শরীফে বর্ণিত দোয়ার প্রারম্ভিক বাক্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে অসীলা স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে। আবার একই দোয়ার দ্বিতীয় বাক্যে যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এতে আল্লাহর দরবারে মক্ববুল বান্দাদের কাছ থেকে শুধু এস্তেগাসার বৈধতা নয়, বরং এর নির্দেশ করা হচ্ছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মানুষের কাছে এস্তেগাসা বৈধ ও বিশুদ্ধ না হত, তাহলে নবী করিম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করার নির্দেশ ও ইরশাদ করতেন না। সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বড় একত্ববাদী যখন স্বয়ং নিজ সত্তার কাছে এস্তেগাসা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে আমরা কে যে, তাওহীদকে একনিষ্ঠ করার ধারণায় ইসলামের প্রকৃত আকাঈদ ও চিন্তাধারা এবং শিক্ষার ধরন মুছে দিয়ে বিশ্বের সকল মুসলমানকে কাফের ও মুশরিক সাব্যস্ত করব?

---

৩৭. ১. তিরমিযী : আস সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, ২/১৯৭, হাদীস : ৩৫০২
২. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৪/১৩৮
৩. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ১/৩১৩, ৫১৯, ৫২৬

একজন সাহাবীর বৃষ্টির জন্য এস্তেগাসা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় এস্তেগাসা এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা এটা প্রমাণিত হবার অসংখ্য দলীল হাদিসের কিতাবসমূহে ভরপুর। বহু সহীহ, মরফু ও মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি সাব্যস্ত আছে সাহাবায়ে কেরামের কাছে যখনই কোন বিপদাপদ পেশ হত তাঁরা দৌড়তে দৌড়তে সরওয়ারে কায়েনাতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান দরবারে এস্তেগাসার জন্য উপস্থিত হতেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসীলা বানিয়ে দোয়া করতেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজত পূর্ণ করার জন্য এস্তেগাসা করতেন। যার ফলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাদের উপর আপতিত বিপদ দূর করে দিতেন। সৈয়্যদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এস্তেস্কার হাদিসকে সহীহ সাব্যস্ত করে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اُدْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.

"সৈয়্যদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অনাবৃষ্টির কারণে খরা হচ্ছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। অতঃপর আমরা ঘরে পৌছার আগে আগেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল, যা পরবর্তী জুমা পর্যন্ত লাগাতার বর্ষিত হতে থাকল। (হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু

আনহু) ফরমাচ্ছেন যে, (পরবর্তী জুমায়) আবার সেই সাহাবী বা অপর কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন এই (বর্ষণ) কে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে হোক, আমাদের উপর না হোক। তখন আমি দেখলাম যে, মেঘমালা ডান ও বাম দিকে সরে গিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল এবং মদীনাবাসীদের উপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল।"[৩৮]

সাহাবার আমলের মাধ্যমে এস্তেগাসা সাব্যস্ত হওয়া এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সাহাবায়ে কেরামকে এ কর্ম থেকে বাধা দেবার পরিবর্তে তাদের হাজত পূর্ণ করা এ কথাকে প্রমাণ করছে যে, এ কাজটি সামান্যতম শিরক হওয়া থেকেও বহু দূরে। কোন সাহাবীর জন্য শিরকে লিপ্ত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। আর এটা তো মোটেই সম্ভব নয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে শিরক থেকে নিজেকে রক্ষার শিক্ষা দেবেন না।

সৈয়্যদুনা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাশেফুল কুরুবাত

সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা সৈয়্যদুনা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদ যুদ্ধে শহীদ হবার কারণে এত অধিক পরিমাণ ক্রন্দন করেছেন যে, তাঁকে সারাজীবনে এত বেশী ক্রন্দন করতে দেখা যায়নি। তিনি ফরমাচ্ছেন যে, সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযাকে কিবলার দিকে রেখে অজোরে ক্রন্দন করতে লাগলেন, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্নার বেগ কমে গেল, তখন সৈয়্যদুনা আমীরে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে ইরশাদ করতে লাগলেন,

يَا حَمْزَةُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ! وَأَسَدَ اللهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ ﷺ! يَا حَمْزَةُ! يَا فَاعِلُ الْخَيْرَاتِ! يَا حَمْزَةُ! يَا كَاشِفُ الْكُرُبَاتِ! يَا حَمْزَةُ! يَا ذَابَّ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

[৩৮]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ইস্তিসকা, ১/১৩৮, হাদীস : ৯৫৯

"হে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু.! হে রাসূলুল্লাহ্‌র চাচা! হে আল্লাহর সিংহ! হে হামযা হে কল্যাণকামী! হে কষ্টসমূহ বিদূরিতকারী! হে রাসূলুল্লাহর নূরানী চেহারার হেফাযত ও সংরক্ষণকারী।"[৩৯]

এ হাদিস শরীফে একজন ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য 'يَا' (ইয়া) দিয়ে আহ্বানের বৈধতার সাথে সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'يَا كَاشِفُ الْكُرُبَاتِ' (হে কষ্ট বিদূরিতকারী)ও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সালেহীন বান্দাদের কাছ থেকে এস্তেগাসাকে বৈধ সাব্যস্ত করেননি, বরং যার কাছে এস্তেগাসা করা হবে তাঁর সাহায্য নেওয়াকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। এ জন্যই তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়্যদুনা আমীরে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দুঃখ বিদূরিতকারী'র মত পছন্দনীয় বাক্য দ্বারা আহ্বান করেছেন। এখানে সৈয়্যদুনা আমীরে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহায্যকারী হওয়াটা রূপকার্থে। কেননা প্রকৃত সাহায্যকারী ও মদদ দানকারী তো শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মহান সত্তা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সৈয়্যদুনা আমীরে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহায্যকারী বলাটা এবং ওফাতের পর তাঁকে দ্বারা আহ্বান করার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, এস্তেগাসার বিষয়ে হাকীকী ও মজাযী (حقيقي و مجازي) প্রকরণই হচ্ছে শরিয়তের মূল। নতুবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম এর সাথে অকাট্যভাবে সামঞ্জস্য হত না।

[৩৯]. আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া : ১/২১২

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যুর পর এস্তেগাসা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ

এস্তেগাসার বৈধতা প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর সকল আহ্‌কাম এবং সাহাবাগণের আমল থেকে ভালভাবে অবগত হবার পরও অনেকে এ ধারণা পোষণ করে যে, পার্থিব জীবনে তো একে অপরের কাজে আসা সম্ভব। সুতরাং সাহায্য চাওয়া ও সাহায্য করাও বৈধ প্রমাণিত হল। কিন্তু মৃত্যুর পর তো বান্দা স্বীয় শরীরের উপরও শক্তিমান থাকেনা। তাহলে তার কাছ থেকে কিভাবে সাহায্য চাওয়া হতে পারে? আর যেহেতু সে সাহায্য করতে অক্ষম, তাই এ কাজটি শিরক।

এ বক্র অনুধাবনের ব্যাপারে আমরা বিশেষতঃ দুটো বিষয়ের বিশ্লেষণ করব। সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে এটি একটি সর্বজনবিদিত বিষয় যে, বান্দা জীবিত হোক কিংবা কবরে আরাম করুক দু'অবস্থাতেই সে নিজের অস্তিত্বের উপর নিঃসন্দেহে স্বয়ং শক্তিমান হয়না। এটা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদানকৃত সেই এখতিয়ারসমূহ, যা আমরা পার্থিব হায়াতে ব্যবহার করি এবং পৃথিবীর সকল কাজ কারবারের আঞ্জাম দিয়ে থাকি। এই এখতিয়ার আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দানে প্রতিষ্ঠিত। যদি জাহেরী হায়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত এখতিয়ার নিয়ে ফেলেন, তাহলে বান্দা একটি কণা নিক্ষেপ করতেও সক্ষম হবে না। সুতরাং যেমনিভাবে এই আলমে আসবাবে (দুনিয়ায়) বান্দার যাবতীয় এখতিয়ারের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা এবং এতদসত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া শিরক নয়; বরং খোদায়ী নির্দেশ। সম্পূর্ণ একইভাবে যদি মৃত্যুর পরও কোন বান্দা (বশর)'র কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই শক্তিমান হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। যেমনিভাবে জীবিত অবস্থায় কোন বান্দাকে প্রকৃত সাহায্যকারী ও ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা শিরক। কিন্তু রূপকভাবে তাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা যায়। তেমনিভাবে মৃত্যুর পর আউলিয়া ও নেককারদেরকে রূপক সাহায্যকারী মনে করে, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়াও জায়েয। শির্ক, জীবিত ব্যক্তির কাছে হোক বা ওফাতপ্রাপ্তের কাছে হোক, তা শিরকই আর রূপক মালিক মনে করে সাহায্য চাওয়া জীবিত ব্যক্তির কাছে হোক কিংবা মাযারবাসীর কাছে হোক, উভয় অবস্থায় শিরক হবেনা। ইসলামের মাপকাঠি দু'রকম নয় যে, মসজিদে তো শিরক হবে না এবং মন্দিরে গিয়ে সেই কাজ করলে শিরক হয়ে যাবে। ইসলামী বিধানাবলী এবং তা থেকে প্রমাণিত বিষয়াদি সকল ক্ষেত্রে সমান

ফলাফল প্রকাশ করে। সুতরাং যদি কোন চিকিৎসককে প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করে তার কাছে চিকিৎসা করা হয়, তাহলে তা শিরক সাব্যস্ত হবে। অথচ অপরদিকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতকেই প্রকৃত সাহায্যকারী জেনে কোন বুযর্গের দোয়া কিংবা কোন মাযারবাসীর অসীলাকে চিকিৎসার মাধ্যম বানানো হলে তাও স্বয়ং বৈধ এবং কখনো শরীয়তের পরিপন্থী নয়।

এখন এ আপত্তি থেকে গেল যে, কবরবাসীর পক্ষে সাহায্য করার শক্তি থাকে না। এটাও একটি অযথা গবেষণা। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে মজীদে অসংখ্য স্থানে আহলুল্লাহদের বরযখী হায়াতের বর্ণনা দিয়েছেন। শহীদদের হায়াতের ব্যাপারে তো কোন মতাদর্শ ও মাযহাবের অনুসারীদের কারো মধ্যে কোন মতভেদ নেই। যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য উম্মত শাহাদতের মর্যাদা পেয়ে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত এবং তাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে জীবিকাও পৌঁছানো হবে, সেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় বরযখী হায়াতের মহান অবস্থা কিরূপ হবে! অতঃপর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হায়াতের আকীদার অধীনে রূপক সাহায্যকারী সাব্যস্ত করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য ও মদদ চাওয়া সম্পূর্ণ দুরস্ত, যেমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী হায়াতের মুবারকাতে জায়েয ছিল। এমনকি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জীবনের তো এ অবস্থা যে, উম্মতের পক্ষ থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালামের যে নজরানা পেশ করা হয়, তাও ফেরেশতা দিন রাত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছে দেয়ার জন্য আদিষ্ট আছেন।

যদি শাফায়াত চাওয়া, সাহায্য চাওয়া ও অসীলা চাওয়া কুফর ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে দুনিয়াতে, বরযখী জীবনে এবং আখিরাতে সকল স্থানে এটা কুফর ও শিরক হওয়াটাই সমীচীন ছিল। কেননা শিরক তো সর্বাবস্থায় আল্লাহর অপছন্দনীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নয়। ইসলামের শিক্ষাতে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে যে, জিন্দেগীতে ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম অসংখ্য স্থানে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসা ও তাওয়াস্‌সুল করেছেন। এটা এস্তেগাসার সাথেই সম্পৃক্ত হবে যে, শফীউল মুযনেবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গুনাহগার লোকদের জন্য শাফায়াত করা হবে। সুতরাং যখন পার্থিব ও পরকালীন জীবনে

এস্তেগাসা বৈধ হলো, তাই হায়াতের একটি অংশ 'হায়াতে বরযখী' তে তা শিরক সাব্যস্ত করা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে?

বরযখী হায়াত (কবর জীবন) এর প্রমাণ

মৃত্যুর পরের জীবন বা কবরের জীবনের হাকীকত কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দ্বারা তেমনিভাবে প্রমাণিত, যেমনিভাবে কিয়ামতের দিন জীবিত হওয়াটা প্রমাণিত। কুরআন হাকীমে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেন-

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

"তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন, তারপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।"[৪০]

এ আয়াতে করীমাতে দুইটি মৃত্যু, দুটি জীবন এবং সর্বশেষে প্রত্যাবর্তন করার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এ আয়াতে করীমার আলোকে প্রথম মৃত্যু মানে আমাদের অস্তিত্ব না হওয়া ছিল, যখন আমরা এ অস্তিত্বের জগতে আসিনি। তারপরের জীবন হচ্ছে আমাদের এ দুনিয়াবী হায়াত। তারপর আবার মৃত্যু আসবে এবং লোকেরা যথারীতি আমাদেরকে কাফন-দাফন করবে। এ মৃত্যুর পরের জীবন হচ্ছে বরযখী (কবর) জীবন, যা প্রত্যেক মানুষের কবরে থাকার সময় অর্জিত হয়। ফেরেশতারা প্রশ্ন করতে আসবেন এবং জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে একটি জানালা কবরে খুলে দেওয়া হবে। এ দ্বিতীয় জীবনের পর হাশরের দিন আমাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হবে। এভাবে কবর জীবনের সময়কাল কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতাদের আগমন থেকে আরম্ভ করে হাশরের দিন ইসরাফীল এর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। এটাতো একজন সাধারণ মানুষ (চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির) এর বরযখী জীবনের কথা শহীদগণের জীবন সম্পর্কে সুরা বাকারারই একটি আয়াত দেখুন-

[৪০]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

"আর যে সকল লোক আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলোনা। (তারা মৃত নয়) বরং জীবিত। কিন্তু তোমাদের কাছে (তাদের জীবনের) অনুভূতি নেই।"[৪১]

এ বিষয়টিকেই সূরা আলে ইমরানে সামান্য ভিন্নতার সাথে এভাবে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"এবং যাদেরকে আল্লাহ্র পথে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে কখনও মৃত ধারণা করোনা; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত। তাদেরকে (বেহেশতের নেয়ামতরাজির) জীবিকা দেওয়া হয়।"[৪২]

সকল মতের অনুসারীগণ শহীগণের জীবিত হবার প্রবক্তা। আমরা উপরোক্ত আয়াতে করিমাগুলো ব্যতীত অসংখ্য হাদিস শরীফেও কাফের ও মুশরিকদের মৃত্যুর পর শ্রবণ করার শক্তি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বদরের যুদ্ধের পর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিহত মুশরিকদের নাম নিয়ে আহবান করেছেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন-

أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴿٤٤﴾

"নিশ্চয় আমরা আমাদের মহান রবের ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য পেয়েছি। সুতরাং (হে কাফের মুশরিক) তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য হিসেবে পেয়েছ?"[৪৩]

[৪১]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৪
[৪২]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৯
[৪৩]. আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ৪৪

ওই সময় সৈয়্যদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এভাবে নিবেদন করলেন- "হুযূর! আপনি এমন শরীরসমূহকে সম্বোধন করছেন, যেগুলোতে রূহও নেই।" এতে হুযূর সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে ফরমালেন-

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ.

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর কব্জায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ আমি তাদের (কাফর ও মুশরিকদের) সাথে যে কথা বলছি, তা তারা তোমাদের চেয়ে ও অধিক শ্রবণ করতে সক্ষম।"[৪৪]

সহীহ বুখারীর এ হাদিস শরীফ দ্বারা কাফের মুশরিকদের পর্যন্ত মৃত্যুর পরবর্তী কবরজগতে শ্রবণশক্তি বিদ্যমান থাকা শুধু সাধারণ জীবিত মানুষের নয় বরং জীবিত সাহাবায়ে কেরামের শ্রবণশক্তির চেয়েও অধিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

এভাবে মুহসেনে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের কবরস্তানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী সকল ব্যক্তিকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা কবরবাসীদেরকে শুধু আহ্বান করার শব্দ ইয়া (يـا) দ্বারা আহ্বান করবে তা নয়; বরং তাদের প্রতি সালামও প্রেরণ করবে। এ কারণেই মুসলমানরা নিজেদের শিশুদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, কবরস্তানের পাশে যাবার সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ অবশ্যই বলবে।

যখন কাফের মুশরিকদের কবর জীবনের হায়াত, সাধারণ মু'মিনদের হায়াত এবং শোহাদা ও সালেহীনদের হায়াত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী বিদ্যমান থাকাটা কুরআন হাদিসের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, বিশেষতঃ তাজেদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতকে অস্বীকার করা হবে? অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বাণীতে বারংবার এটা ঘোষণা করেছেন যে-

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.

[৪৪]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মাগাজী, ২/৫৬৬, হাদীস : ৩৬৭৯

"আল্লাহ্ তা'আলা জমির জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যেন তা নবীগণের শরীরকে ভক্ষণ না করে। সুতরাং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম জীবিত এবং তাদেরকে রিযক পৌছানো হয়।"[৪৫]

এ হাদিস শরীফ থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কুদরতে কামেলার দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরাম স্বীয় কবরে জীবিত থাকেন। একটি হাদিস শরীফে একথা পর্যন্ত বর্ণিত আছে যে, সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উম্মতের আমলসমূহ পেশ করা হয়। নেক-আমল দেখলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শোকর আদায় করেন। বদ-আমলকারীদের জন্য আল্লাহর কাছে উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। হাদিস মুবারকের ভাষ্য নিম্নরূপ-

تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اِسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ.

"আমার কাছে তোমাদের আমলসমূহ পেশ করা হয়। তা উত্তম হলে, তাহলে আমি আল্লাহ্র শোকর আদায় করি। যদি আমল উত্তম না হয়, তখন আল্লাহ্র কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করি।"[৪৬]

সেই মহা শক্তিশালী আল্লাহ্ যিনি এ দুনিয়াতে এবং পরকালে সকল মানুষকে জীবন দানের এবং রিযিক দান করার উপর শক্তিমান। তিনিই আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে কবরসমূহে জীবিত রাখতে ও রিযিক পৌছাতে সক্ষম। গ্রীক দর্শনের রূহের বরযখী হায়াত (কবর জীবন) এর প্রতি সন্দেহে নিপতিতকারী অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক আলোচনাসমূহ ইসলামের অপরিবর্তনীয় এবং অটল ফিতরতী নীতিমালার সম্মুখে কোন মূল্য রাখেনা। ইসলামী আহকাম সুস্পষ্ট বিস্তারিত ও অকৃত্রিমভাবে হায়াতের প্রকার এবং বরযখী হায়াতের বাহক ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করার ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের শিক্ষাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে। একথা স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, শোহাদায়ে কেরাম, সালেহীন,

[৪৫]. ১. নাসায়ী : আস সুনান, কিতাবুল জুমা, ১/২০৪
২. আবু দাউদ : আস সুনান, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৭
৩. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, কিতাবুল জানায়েয, ১/১১৯

[৪৬]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৬/৪৬৮, হাদীস : ৭০৬৫
২. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/২৪

সাধারণ মুসলমান, এমনকি কাফের ও মুশরিকগণও নিজেদের কবরে জীবিত থাকে। শোহাদায়ে কেরামকে তো বরযখী আসবাবের অধীনে রিযিক পৌঁছানোর ব্যাপারে কুরআন স্বয়ং ন্যায় স্বাক্ষী। সুতরাং যারা জাহেরী হায়াতে এস্তেগাসাকে বৈধ মেনে নিয়ে মৃত্যুর পর এস্তেগাসাকে হারাম বরং শিরকের মাধ্যম বলে গণ্য করে, তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে একথা বলা যায় যে, মৃত্যু একটি মুহূর্তের আস্বাদন যা এসে দূরীভূত হয়ে যায়। হাকীমুল উম্মত রহমতুল্লাহি আলাইহির উক্তি-

موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے

خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام ہے

'মৃত্যু নতুন জিন্দেগীর আস্বাদনের নাম, যা হচ্ছে নিদ্রার আড়ালে জাগ্রত হবার পয়গাম।'

পার্থিবজীবন এবং কিয়ামতের দিন প্রদানকৃত পরকালীন জীবনের মধ্যখানে কবরজীবনের সময়কাল বিদ্যমান। অতঃপর যেমনি পার্থিব ও পরকালীন জীবনের বাহক মানুষের কাছে এস্তেমদাদ, এস্তেআনত এবং এস্তেগাসা বৈধ, তেমনি বরযখী হায়াতে (কবর জীবন) ও এস্তেগাসা বৈধ। এতে শিরক তো দূরের কথা, এর সামান্য পরিমাণও নেই। কেননা পার্থিব, বরযখী এবং পরকালীন তিনটি জীবনেই আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রকৃত সাহায্যকারী এবং বান্দাকে রূপক সাহায্যকারী মেনে নিয়ে সাহায্য চাওয়া যায়, তা জায়েয। এ তিন প্রকারের হায়াতের যে কোন জীবনে বান্দাকে প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করা নিঃসন্দেহে শিরক। প্রকাশ থাকে যে, শিরকের সবব (কারণ) হায়াতের প্রকারভেদ নয়। বরং হাকীকত ও মাযাজের পার্থক্যকরণ মাত্র।

রূহের হায়াত এবং শক্তি

মানবীয় আত্মাসমূহের কবর জীবন সম্বন্ধে অকাট্য দলীল সহকারে সত্য প্রমাণিত হবার পর মৃত্যুর পর এস্তেগাসাকে অবৈধ মনে করাটা মূর্খতা কিংবা অসততা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আম্বিয়া ও সালেহীনদের রূহ হতে মদদ ও সাহায্য চাওয়া সম্পূর্ণরূপে তেমনিভাবেই বৈধ, যেমনিভাবে কোন জীবিত মানুষ কিংবা ফেরেশতার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। যখন আমরা জীবিত অবস্থায় কোন মানুষের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হই, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর রূহ থেকেই সাহায্য চাই। মানবীয় শরীর তো মূল মানবীয় রূহের পোষাক স্বরূপ। মৃত্যুর পর যখন রূহ শরীরের শারিরীক কদর্যতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন

মাটির শরীর থেকে অধিক অবস্তুগত কার্যাবলী সমাধা করতে সক্ষম হয়ে যায়। আমাদের জড়পদার্থের জগতে কর্মের যে সকল নিয়ম প্রসিদ্ধ রূহ সে সকল নিয়মনীতির বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেননা তার জগত.... অর্থাৎ আদেশের জগত শরীরের এই কারণিক জগত থেকে ভিন্ন। এ রহস্যের বিষয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴿٨٥﴾

"তারা (কাফের) আপনার কাছে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, রূহ আমার মহান রবের একটি নির্দেশ।"[৪৭]

রূহসমূহ কবর জীবনে নির্দেশের জগতের (আলমে আমর) যে জীবন দান করা হয়, তাতে তা দুনিয়ার শারিরীক জীবনের চাইতে অধিক কার্যাবলী সম্পাদনে সক্ষম হযে যায় এবং আহ্বানকারী ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে সাহায্য করতে পারে। যদি এস্তেগাসাকে শুধু অনুভূতি ও দর্শনের অধীনেই বৈধ মানা হয়, তাহলে তা ঈমানের নিদর্শন নয়। বরং তা দার্শনিকদের নীতি। অথচ পূর্ববর্তী দার্শনিকদের আলোচনা ঈমানী সুক্ষ্ম বিষয়াদির সংবাদ দিতে পারে না। ঈমানী রহস্যাবলী জানার জন্য অন্তরের অনুভূতি ও ইশকের (ভালবাসা) প্রেরণা প্রয়োজন। প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়া ও আউলিয়া কর্তৃক সাহায্য প্রত্যাশীদেরকে সাহায্য করার অর্থ হচ্ছে তারা সাহায্য প্রার্থীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দরবারে দোয়া করবেন এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁদের দোয়া কবুল করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাজত পূরণ করে দেবেন। এটা পুরোপুরি সেরূপ, যেমনিভাবে বড়রা কোন শিশুর জন্য কিংবা ভাই স্বীয় ভাইয়ের জন্য দোয়া করে থাকে। মাসআলা হচ্ছে শুধু এতটুকু যে, এতে অভিযোগকারীরা কবর বাসীদের হায়াতের অস্বীকার করে তাদেরকে দোয়া করার যোগ্য মনে করে না। অথচ বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা হচ্ছে তারা জীবিত। আপন অনুভূতি ও জ্ঞান দ্বারা যিয়ারতকারীদেরকে চিনেন। শরীর হতে পৃথক হয়ে যাবার পর রূহের অনুভব শক্তি আরও পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং মানবীয় প্রবৃত্তিসমূহ দূর হয়ে যাবার কারণে মাটির পর্দাসমূহ উঠে যায়।

এস্তেগাসার ব্যাপারটি এভাবেও বুঝা যায় যে, যে সত্তা থেকে সাহায্য চাওয়া হয়, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই। কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী

[৪৭]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৮৫

এভাবে নিবেদন করেন, যেন সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাজত পূরণের আশাবাদী হন। সে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের অসীলা নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিবেদন করছে যে, আমি এই আউলিয়া ও নেককারদের মুহিব্বীন ও মাহবূবীনদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের মুহাব্বত ও নৈকট্যের কারণে বিশেষ দয়া ও বদান্যতার উপযুক্ত। এতে আল্লাহ তা'আলা তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা দোয়াতে বর্ণিত আউলিয়ায়ে কেরামের অসীলায় সে ব্যক্তির গুণাহ সমূহকে ক্ষমা করে তার হাজত পূরণ করে দেন।

জানাযার নামায আদায়কারীদের জন্য মৃতের ক্ষমার দোয়া করাও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা জানাযাতে উপস্থিত লোকেরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র দরবারে মৃতের ক্ষমার জন্য অসীলা বানিয়ে থাকে এবং তার সাহায্যকারী হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আপত্তিসমূহের উত্তর

আম্বিয়া, আউলিয়া, সুলাহা ও শোহাদায়ে কেরামের নিকট সাহায্য চাওয়া, ফরিয়াদ করা যদিও স্বয়ং হক্ব ও বিশুদ্ধ এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণিত, তবুও অভিযোগকারীরা কিছু মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এস্তেগাসাকে শিরক বলা থেকেও ক্ষান্ত হননি। এ অধ্যায়ে আমরা এস্তেগাসা সম্পর্কে কৃত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিসমূহ উল্লেখ করে কুরআন হাদীসের দ্বারা এস্তেগাসা প্রমাণিত হবার দলীলসহ উত্তর পেশ করব।

প্রথম আপত্তি

এস্তেগাসা স্বয়ং একটি ইবাদত

অপরের কাছে সাহায্য চাওয়াকে শিরক সাব্যস্ত করার জন্য সর্বপ্রথম এটাকে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয় যে, যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা শিরক সেহেতু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত অন্য কারো কাছে এস্তেআনত ও এস্তেগাসা (সাহায্য চাওয়া) করাও শিরক। এ বিষয়টিকে সাব্যস্ত করার জন্য কয়েকটি আয়াত ও দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী-

1- أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴿٦٢﴾

"উৎপীড়িত লোকেরা যখন তাঁকে আহ্বান করে তখন কে তাদের অনুনয় প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং (কে তার) দুঃখ-দুর্দশা মোচন করেন!"[৪৮]

2- وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

"যাদেরকে এরা (মুশরিক) লোকেরা আল্লাহ ছাড়া পুজা করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। (তারা) মৃত, জীবিত নয় এবং এদের (এতটুকুও) অনুভূতি নেই যে (মানুষকে) কখন পুনরুত্থান করা হবে।"[৪৯]

---

[৪৮]. আল-কুরআন, সূরা নমল, আয়াত : ৬২

[৪৯]. আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ২০-২১

3- وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

"এবং তিনি ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর, তারা খেজুরের দানার একটি ছালের (বাকল) সমানও শক্তি রাখেনা। যদি তোমরা এদেরকে আহ্বানও কর, তবুও তারা তোমাদের আহ্বান শুনতে পায়। এবং যদি (মনে করা হয় যে,) তারা শুনেও নেয়, তাহলে তোমাদের প্রার্থনা কবুল করতে পারবে না এবং কিয়ামতের দিন তোমাদের এ অংশীদার বানানোর কথা অস্বীকার করবে এবং জ্ঞাত লোকের মত তোমাদেরকে কোন সংবাদ দেবে না।"[৫০]

4- وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾

"এবং তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হতে পারে, যে আল্লাহ্ ছাড়া এমন (উপাস্যদের) কে আহ্বান করে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে না। বরং তাদের আহ্বানের খবর সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ।"[৫১]

5- يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٢﴾

"সে (ব্যক্তি) আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করছে, যে তার ক্ষতিও করতে পারে না এবং তার উপকারও করতে পারে না।"[৫২]

[৫০]. আল-কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত : ১৩-১৪
[৫১]. আল-কুরআন, সূরা আহক্বাফ, আয়াত : ৫
[৫২]. আল-কুরআন, সূরা হজ্ব, আয়াত : ১২

6- وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ﴿١٠٧﴾

"এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সেটার (মূর্তি) বন্দেগী করোনা, যা না তোমার উপকার করতে পারে, না অপকার; অতঃপর যদি তুমি এমন করো তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং আল্লাহ যদি তোমাকে কোন দুঃখ-কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত সেটা মোচনকারী কেউ নেই।"[৫৩]

7- يَدْعُوا۟ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ﴿١٣﴾

"তারা তারই বন্দেগী করে, যার অপকার তার উপকারের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী।"[৫৪]

উপরে বর্ণিত আয়াতে মুবারকাগুলোতে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে আহ্বানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই দলীল দেওয়া হয় যে, সাহায্য চাওয়া ও আহ্বান করা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া হলে তা আল্লাহর গুণাবলীতে শরিক করার মধ্যে গন্য হবে। এরূপ দলীল লওয়াটা স্বয়ং অশুদ্ধ। নীচে আমরা এ ধারণার বিশ্লেষণ করব।

সকল এস্তেগাসা ইবাদত হয় না

উপরোক্ত আয়াত শরীফে দোয়া শব্দটি ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজিদে দোয়া শব্দটি সকল স্থানে ইবাদত অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। নতুবা এ বিপথগামী চিন্তা তো (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম এবং স্বয়ং আল্লাহর মহান সত্তার উপরও মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা এবং অসম্ভব বিষয়ে নিজের জ্ঞান সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যেমন- কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

1- فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ ﴿٦١﴾

[৫৩]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ১০৬-১০৭
[৫৪]. আল-কুরআন, সূরা হজ্ব, আয়াত : ১৩

"তবে তাদের বলে দিন, 'এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে।"[৫৫]

2- فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴿٢٥﴾

"অতঃপর তাদের (কন্যাদের) দু'জনের একজন তার নিকট এলো শরমজনিত চরণে চলতে চলতে (এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে ডাকছে তোমার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য এরই যে, তুমি আমাদের পশুগুলোকে (বকরীগুলো) পানি পান করিয়েছো।"[৫৬]

3- ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ﴿٢٥٢﴾

"অতঃপর (তা যবেহ করে) একেক খণ্ড প্রতিটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, তারপর ওগুলোকে আহ্বান করো, ওগুলো তোমার নিকট দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসবে।"[৫৭]

4- يَوْمَ نَدْعُوا۟ كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَـٰمِهِمْ ﴿٧١﴾

"যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহ্বান করবো।"[৫৮]

এ আয়াত শরীফের তাফসীরে সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগের ইমামের প্রশংসা করতে গিয়ে ফরমাচ্ছেন-

بِإِمَامِ زَمَانِهِمْ الَّذِيْ دَعَاهُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ هُدىً.

"এ থেকে যুগের সেই ইমাম উদ্দেশ্য যার দাওয়াতে দুনিয়াতে লোকেরা চলে থাকে, চাই তা (দাওয়াত) ভ্রষ্টতার দিকে হোক কিংবা হিদায়াতের দিকে হোক।"[৫৯]

[৫৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬১
[৫৬]. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ২৫
[৫৭]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬০
[৫৮]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭১
[৫৯]. তাফসীরে মা'আলেমুত তানযীল : ৩ /১২৬

এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক গোত্র স্বীয় দলনেতার কাছে একত্রিত হবে, যার নির্দেশে সে দুনিয়াতে চলতো এবং তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত স্বয়ং তার নামেই আহ্বান করবেন যে, "হে অমুকের অনুসারীগণ! তোমাদের পরিণাম তার সাথেই।"

মোটকথায় উপরোক্ত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহে দোয়া শব্দের অর্থ ইবাদত করার দ্বারা স্বয়ং শিরকের পথ খুলে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, যদি দোয়ার সম্বন্ধ কাফের ও মুশরিকের প্রতি করা হয়, তাহরে এর অর্থ ইবাদত হবে। নতুবা বাচনভঙ্গি ও বক্তব্য অনুযায়ী অর্থ পরিবর্তন হবে। এস্তেগাসা বৈধ না হবার ব্যাপারে যে সকল আয়াত প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে, সেগুলোতে দোয়ার সম্বন্ধ কাফের ও মুশরিকদের প্রতি হয়। সুতরাং সেখানে ইবাদতের অর্থই করা হবে। কিন্তু ওই সব আয়াত দ্বারা এস্তেগাসা বৈধ না হওয়াটা সম্পূর্ণভাবে সাব্যস্ত হয় না। এজন্য যে, আল্লাহর দরবারের যে সকল মক্ববূল বান্দাদের কাছে এস্তেগাসা করা হয়, তাঁদেরকে অকাট্যভাবে ইবাদতের যোগ্য মনে করা হয়না।

দ্বিতীয় আপত্তি

আসবাব উর্ধ্বের জিনিসগুলোতে এস্তেগাসা শিরক

এ আপত্তির ভিত্তি একটি প্রকারভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এস্তেগাসার আলোচনার মধ্যখানে আসবাবের অধীন সাধারণ বিষয়গুলোর দুটো প্রকার বর্ণনা করা হয়।

১) অভ্যাসগত বিষয়াবলী (امور عادیہ) অর্থাৎ আসবাবের অধীন বিষয়াবলী।

২) অভ্যাস বহির্ভূত বিষয়াবলী (امور غیر عادیہ) অর্থাৎ আসবাব উর্ধ্ব বিষয়াবলী।

এ প্রকরণের অধীনে আসবাব (কারণ) এর অধীন হবার কারণে امور عادیہ বা অভ্যাসগত বিষয়াবলীতে এস্তেগাসাকে বৈধ মনে করা হয়। যেখানে امور غیر عادیہ বা অভ্যাস বহির্ভূত বিষয়াবলী যা আসবাবের উর্ধ্বে, তাতে এস্তেগাসাকে শিরক সাব্যস্ত করা হয়। যে সকল কাজ সাধারণতঃ আসবাবের মাধ্যমে সমাধা হয়, সেই সকল অভ্যাসগত আসবাব (মাধ্যম) কে ত্যাগ করে সাহায্য চাওয়াকে 'استغاثہ مافوق الاسباب' বলা হয়। আর অভ্যাসগত আসবাবকে গ্রহণ করে সাহায্য চাওয়াকে 'استغاثہ ماتحت الاسباب' বলা হয়। অর্থাৎ এতে কারো কাছে সাহায্য চেয়ে

এ সকল আসবাবকে এখতিয়ার করে নেয়া হয়। যা সাধারণভাবে এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ প্রকরণের পর এ বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, তাদের মতে, পার্থিব প্রয়োজনাদিতে পরস্পর একে অপরের সাহায্য করা এবং সামষ্টিক বিষয়ে সাহায্য করা 'এস্তেগাসা মা তাহতাল আসবাব' এবং এটা জায়েয। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ

"এবং সৎ ও তাকওয়া (এর কাজে) এর মধ্যে একে অপরকে সহযোগিতা করো।"[৬০]

'মা তাহতাল আসবাব' বিষয়ে এস্তেগাসাকে বৈধ রাখার সাথে সাথে তাদের মতে যেই এস্তেগাসা 'মা ফাউকাল আসবাব' বিষয়ে হবে, তা হারাম ও না-জায়েয।

আপত্তির ইলমী (জ্ঞানগত) ফায়সালা

প্রথম সুক্ষ্ম বিষয় : استغاثہ ماتحت الاسباب এবং استغاثہ مافوق الاسباب তে পরেরটিকে শিরক সাব্যস্ত করা হচ্ছে। অথচ এই প্রকরণ এবং এর অধীনে প্রাপ্ত একটি প্রকারের বৈধতা এবং অন্যটির অবৈধতা হবার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্তে কোন উল্লেখ নেই। এটি একটি মনগড়া প্রকার এবং চিন্তাগবেষণা প্রসূত। কোন প্রকারের কোন কুরআনী নস এস্তেগাসার অধীনে আসবাবের বরাতে প্রাপ্ত প্রকারভেদ সম্পর্কে দেখা যায় না।

এখানে আমাদেরকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আসবাব উর্ধ্ব বিষয়াদিতেও কোন না কোন মাধ্যম অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে। 'كُنْ فَيَكُوْنُ' ব্যতীত কোন নির্দেশ মাধ্যমের উর্ধ্বে নেই। কিন্তু যেহেতু কতিপয় বিষয়াদির মাধ্যম প্রকাশ্যভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এ কারণে আমরা এগুলোকে সাধারণভাবে "মাধ্যম ব্যতীত বিষয়" (امور مافوق الاسباب) বলে থাকি।

দ্বিতীয় সুক্ষ্ম বিষয় : সূরা ফাতেহার যেই আয়াতে করীমাকে মাসআলা (চাওয়া)'র মূল ভিত্তি এবং আসল মনে করা হয়, স্বয়ং তাতে আসবাবের অধীন করা কোন প্রকারের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' বলে সাহায্য চাওয়াকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। কায়দা আছে যে, اَلْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلَي

[৬০] আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ২

إِطْلَاقِهِ (মুতলাক স্বীয় এতলাক বা অনির্দিষ্টের উপর প্রয়োগ হয়)। এ জন্য আমরা নিজেদের তৈরি কোন প্রকারের অধীনে এ অর্থ নির্দিষ্ট করতে পারিনা যে, হে মহান রব! আমরা তোমার নিকট শুধু আসবাব উর্ধ্ব বিষয়ে সাহায্য চাই, কেননা তা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারেনা। অবশিষ্ট রইলো আসবাব অধীন বিষয়াবলী। তাতে যেহেতু তুমি ব্যতীত সাহায্য লাভ করার আরও অনেক মাধ্যম বিদ্যমান, তাই সে সকল বিষয়ে তোমার কাছে সাহায্য চাওয়ার কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন নেই। এ ধরনের প্রকারভেদ করা স্বল্প জ্ঞান ও অজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সহীহ অর্থে এটাই শিরকে লিপ্তকারী।

তৃতীয় সুক্ষ্ম বিষয় : মাসআলা অনুধাবন করা, সন্দেহ দূরীকরণ এবং এক জিনিসকে অন্য জিনিস থেকে পৃথক করার জন্য এগুলোতে প্রকারভেদ করা হয়। কিন্তু এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' এ উপরোক্ত প্রকরণ এর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও প্রকরণ করা এবং এরপর আসবাব অধীন বিষয়গুলোতে এস্তেগাসাকে জায়েয মনে করার বৈধতা কী? যখন امور مافوق الاسباب -এ শিরকের ফতোয়া জায়েয ও দূরস্ত সাব্যস্ত করা হচ্ছে। যদি 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' এর মধ্যে হাকীকী ও মজাযী এস্তেগাসার প্রকারভেদ করা হয়, তাহলে তা পরে কেন মানা যাবেনা? প্রকৃতপক্ষে 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' এর মধ্যে প্রকারভেদ তো আছে, কিন্তু امور مافوق الاسباب এবং امور ماتحت الاسباب এর স্থলে হাকীকত ও মাজাযের প্রকারভেদ বিদ্যমান।

বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা

'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' এর বাক্যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের প্রয়োজনাদির জিম্মাদারের জন্য বাহ্যিকভাবে কারো কাছে সাহায্য প্রার্থী হলেও, তাকে প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করিনা। বরং প্রকৃত সাহায্যকারী শুধু তোমাকেই মনে করি। কেননা তোমার অসন্তুষ্টি থাকলে কেউ আমাদের সাহায্যকারী ও অবস্থা জিজ্ঞাসারী হতে পারেনা। আমাদের আকীদা তো এটাই যে, আমরা ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্য হয়ে থাকি কিংবা কোন বুযর্গের দোয়ায় আরোগ্য হই, কাউকেই প্রকৃত সাহায্যকারী ধারণা করি না; বরং প্রকৃত সাহায্যকারী তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। আমরা ঔষধ ও দোয়া

দুটোকে সবব (মাধ্যম) এর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিই না। কেননা প্রকৃত সাহায্যকারী ও কর্মসম্পাদনকারী তুমিই।

চতুর্থ সূক্ষ্ম বিষয় : এখন চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে উভয় প্রকরণ امور مافوق الاسباب ও امور ماتحت الاسباب এবং হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে সমন্বয় করা কীভাবে সম্ভব? নিঃসন্দেহে জীবনের অনেকগুলো বিষয়ে আসবাব এর অধীন এবং আসবাব বর্হিভূত বিষয়ের প্রকারভেদ করা বৈধ। এটা বাস্তব বিষয় এবং অনুধাবন ও অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত জিনিস, যার প্রমাণ দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। আসবাবের অধীন কিছু বিষয় এতে সমাধান হয়ে যায় এবং নেক বিষয়ের সমাধানে আসবাব উর্ধ্বের বিষয়াবলী অনুসন্ধান করতে হয়। মূলত আসবাব উভয় প্রকারেই পাওয়া যায়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আসবাবের অধীন বিষয়গুলোতে আসবাব সুস্পষ্ট হয়, অথচ আসবাব উর্ধ্ব বিষয়গুলোতে আসবাব সকল মানুষের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়। আসবাব বর্হিভূত বিষয়কে যাহেরী এবং আসবাব এর অধীন বিষয়কে রূহানী ও বাতেনী আসবাব বলা অধিক উপযুক্ত হবে। আসবাব বর্হিভূত বিষয়গুলোতে যদিও অভ্যাসগত জিনিসসমূহ ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু اسباب غير عادية এর অস্তিত্ব এখানেও ভালভাবে পাওয়া যায়, যেন হাকীকী অর্থের মধ্যে কোন জিনিসই সাধারণত আসবাব এর উর্ধ্বে হয় না। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে ماتحت الاسباب -এ আসবাব যাহেরী হয়, যা সাধারণ বান্দাকে দেখানো হয়। যখন مافوق الاسباب -এ আসবাব اسباب غير عادية হবার কারণে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে না।

যখন আম্বিয়া, আউলিয়া, সালেহীন কিংবা যে কোন মানুষের এ জগতে অবস্থানকালে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহায্য চাওয়া হয়, তখন যে সকল বাক্য সাহায্য অর্জনের জন্য ব্যবহার হয়, সেগুলোকে হাকীকী অর্থে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু প্রকৃত সাহায্যকারী সেই সময়ও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বরহক্ব সত্তাই হবে। আর এস্তেগাসার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলি রূপকার্থে ব্যবহার হবে। তখনও আকীদা হবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের হাকীকী সাহায্যকারী হবার। অর্থাৎ হাকীকী অর্থ উভয় অবস্থায় কোনটাতেই পাওয়া যাবে না। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ماتحت الاسباب এর মধ্যে শব্দের ব্যবহার হাকীকতের ভিত্তিতেই ছিল এবং مافوق الاسباب এর মধ্যে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য করা অসম্ভব ছিল। এ কারণে শব্দকেও প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। মোটকথা অর্থগত

এবং আকীদাগতভাবে হাকীকী এস্তেগাসা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্যই নির্দিষ্ট। (তাওহীদ ও শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অধ্যয়নের জন্য লিখকের গ্রন্থ "আকীদা-ই তাওহীদ আওর হাকীকতে শিরক" বইটি দেখুন।)

হাকীকত ও মাজায এর প্রকরণ করা অপরিহার্য

মূল এস্তেগাসাকে অস্বীকারকারী একটি দলের বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে, ماتحت الاسباب বিষয়ে এস্তেগাসা জায়েয। যখন এ প্রসঙ্গ হাকীকত ও মাজাযের কোন ভিত্তি নেই। এখন এ দলের প্রবক্তাদের প্রতি প্রশ্ন হচ্ছে যদি ماتحت الاسباب -এ এস্তেগাসাকে জায়েয ও বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া হয় এবং হাকীকী ও মাজাযী এস্তেগাসাকে মেনে নেয়া না হয়, তাহলে এরপর ماتحت الاسباب বিষয়গুলোতে হাকীকী সাহায্যকারী কে হবে? যদি রোগী কোন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য যায়, তাহলে প্রকৃত সাহায্যকারী কে হলো? প্রকৃত সাহায্যকারী সেই ডাক্তার যে রোগীর চিকিৎসার প্রচেষ্টা করছে, না কি আল্লাহ তাআলা? যদি এর উত্তর এটা হয় যে, পার্থিব বিষয়াদিতেও প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহই, তাহলে مافوق الاسباب ও ماتحت الاسباب এর মধ্যে পার্থক্য কি থাকল? مافوق الاسباب এর মধ্যে এই এস্তেগাসার নামই শিরক এবং ماتحت الاسباب -এ অনুমতি আছে! এটা কোথাকার নীতি যে, হাকীকত ও মাজাযের পার্থক্যের বিবেচনা করা ব্যতীত সাধারণ সাহায্যকারীও আল্লাহকে সাব্যস্ত করা হবে এবং তাঁকে ব্যতীত অন্যের কাছেও সাহায্য চাইতে থাকবে? অথচ কুরআন মজিদে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

"এবং আমাদের মহান রব অশেষ দয়ালু। তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়, সেই সকল (অন্তরকে ব্যথাদানকারী) বিষয়ে যা (হে কাফিরগণ!) তোমরা বর্ণনা করে থাক।"[৬১]

অপরদিকে যদি এর উত্তর এটা দেওয়া হয় যে, ماتحت الاسباب বিষয়গুলোতে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নয়, মানুষই, তাহলে এতে সংখ্যা (تعدد) আবশ্যক হবে, যা নিশ্চিতভাবে শির

[৬১] আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১১২

পার্থিব কাজে সাহায্যকারী বান্দা হবে এবং আসবাব ঊর্ধ্ব বিষয়াদিতে সাহায্যকারী আল্লাহ তা'আলা। এই দুইয়ের ভিত্তিতে যখন বান্দাকে সাহায্যকারী ও সহযোগিতাকারী মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ সেইরকম শিরক সাব্যস্ত হবে, যা মক্কার কাফির ও মুশরিকরা করত। অর্থাৎ তারা পার্থিব বিষয়াদিতে বান্দাকে সাহায্যকারী হিসেবে এবং অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্যকারী মানত। যদি একথা বলা হয় যে, পার্থিব বিষয়াদি তো ও আল্লাহই সাহায্যকারী, তাহলে তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া কিভাবে দুরস্ত হলো?

এতে মীমাংসার কথা হচ্ছে এটা যে, যখন অভিযোগকারীদের দৃষ্টিতে আসবাবের অধীন বিষয়ে প্রকৃত সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ, রূপক অর্থ হিসেবে, প্রকৃত অর্থে নয়, তাহলে তখন একটি প্রশ্ন পেশ হয় যে, যদি আসবাবের অধীন বিষয়ে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া রূপক এস্তোগাস হবার কারণে বৈধ, তাহলে আসবাবের ঊর্ধ্বের বিষয়ে মাজায হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তা হারাম হয়ে গেল? যখন সেখানেও হাকীকী এস্তেগাসার পরিবর্তে মাজাযী এস্তেগাসাই ছিল।

আসবাব ঊর্ধ্বের বিষয়াদিতে মাজায বৈধ হওয়া

আসবাব ঊর্ধ্বের (مافوق الاسباب) বিষয়াদিতে মাজায বা রূপকের ব্যবহার এ দৃষ্টিতেও জায়েয যে, তা প্রকাশ্যভাবে যদিও এস্তেগাসা হয়ে থাকে, কিন্তু এর অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওয়াসসুল বা অসীলা গ্রহণ। প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করা হয়। তাছাড়া রূপক অর্থে এস্তেগাসা কুরআন মজিদে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেগুলোর অধিকাংশ مجاز مافوق الاسباب (আসবাব ঊর্ধ্ব বিষয়ে রূপকার্থ) এর জন্য এসেছে, তা থেকে কয়েকটি ক্ষেত্র আমরা এখানে বর্ণনা করব, যাতে পাঠকদের অন্তরে এ বিষয়টি উত্তমভাবে দৃঢ় হয়ে যায় যে, হাকীকত ও মাজাযকে অস্বীকার করলে কতটুকু বিপজ্জনক পরিণতির আশংকা হতে পারে।

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের উপর শিরকের ফতোয়া

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সাল্লামের জন্মের ধারাবাহিকতায় হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালামের কাছে মানবীয় রূপে আসেন। তখন তাঁকে বললেন-

إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

"(জিবরাঈল) বললেন, আমি তো শুধু তোমার মহান রবের প্রেরিত হই (এ জন্য এসেছি) যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবো।"[৬২]

উপরোক্ত আয়াতে জিবরাঈল আমীন এর উক্তি مافوق الاسباب তথা আসবাব ঊর্ধ্বের বিষয়াদির ব্যাপারে। কেননা বিবাহ ও সাংসারিক জীবন ব্যতীত পুত্র হওয়া এবং এ সম্পর্কে একথা বলা যে, "আমি তোমাকে পবিত্র সন্তান দান করব" আসবাব ঊর্ধ্ব বিষয়ে সাহায্য করার পক্ষে অনেক বড় কুরআনী দৃষ্টান্ত এবং সাধারণত মাধ্যম ব্যতীত এ দুনিয়ায় এ বিষয় হবার ধারণা করাও অসম্ভব।

লক্ষ্যণীয় যে, যদি কেউ শুধু অসীলার নিয়তে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কোন বুযর্গ বান্দার অসীলা নিয়ে সন্তান কামনা করে, তখন কতিপয় অজ্ঞ লোকেরা সাথে সাথে শিরকের ফতোয়া না দিয়ে ক্ষান্ত হন না। অথচ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলছেন যে, "আমি সন্তান দান করছি" এবং আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর বর্ণনা কুরআন মজিদে করছেন। তাহলে এটাও কি সেভাবে শিরক হবে না? প্রার্থনার সময় তো প্রার্থনাকারী তারপরও মানুষই থাকে। কিন্তু এটা বলা যে, "আমি পুত্র দান করছি" এ বাক্যকে যদি রূপক অর্থে বুঝানো না হয় তাহলে হাকীকী অর্থে তো এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ হবার সমার্থক। সন্তান দান করা আল্লাহর কাজ; বান্দা গাইরুল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা যদি শিরক হয়, তাহলে খোদা ভিন্ন অন্য কোন দাতার একথা "আমি সন্তান দিচ্ছি" তাহলে তাকে তো আরও উত্তমভাবে শিরক সাব্যস্ত করা চাই। এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, হযরত জিবরাঈল আমীন আলাইহিস সালাম তো لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا বলেও (আল্লাহ ক্ষমা করুন) মুশরিক হননি। বরং তাঁর বাণী সত্য বাণী হয়ে রইলো। তাহলে তাঁর এ উক্তির প্রকৃত বিশ্লেষণ কি হবে?

উত্তর : এ উক্তিটি যদিও রূহুল আমীনের অর্থাৎ "আমি সন্তান দিচ্ছি" কিন্তু এর অর্থ এটাই যে, সেই পুত্র যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দানকারী আমি উহার সবব (মাধ্যম), অসীলা ও মাধ্যম হচ্ছি। অতঃপর বর্ণিত আয়াতে করীমাতে لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا এর মধ্যে সাহায্য করার আমল পাওয়া গেল। কিন্তু

[৬২]. আল-কুরআন, সূরা মরিয়ম, আয়াত : ১৯

এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু অসীলা গ্রহণ। আর তাঁর সন্তান দান করার কথা কুরআনের মাজাযের একটি প্রকৃষ্ট উদাহারণ।

সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর শিরকের ফতোয়া

সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিমুস সালাম যখন স্বীয় উম্মতের সামনে সত্যবাণী প্রচার করলেন, তাদেরকে শিরক থেকে বিরত থাকতে এবং আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি স্বীয় কওমকে বিভিন্ন মু'জিযা দেখালেন। কুরআন মজিদে তাঁর সেই দাওয়াতের কথা এভাবে এসেছে-

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট একটা নিদর্শন নিয়ে এসেছি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখি হয়ে যায়- আল্লাহর নির্দেশে এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে, আর আমি আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমাদেরকে বলে দিই, যা তোমরা আহার করো আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাখো। নিশ্চয় তাতে তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে। যদি তোমরা মু'মিন হও।"[৬৩]

এ আয়াতে করীমাতে সৈয্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের পবিত্র হাত থেকে মোট পাঁচটি মু'জিযা প্রকাশের কথা বর্ণিত হয়েছে।

১. মাটি থেকে পাখি বানিয়ে তা জীবিত করা।
২. মাতৃগর্ভের অন্ধের আরোগ্য করা।

ছিল

আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯

৩. সাদা দাগ (শ্বেত) এর আরোগ্য করা।
৪. মৃতকে জীবিত করা।
৫. অদৃশ্য সংবাদসমূহ সবার সম্মুখে বলে দেওয়া।

এ পাঁচটি মু'জিযা আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন এবং তিনি ঘোষণা সহকারে এগুলো প্রকাশও করেছেন। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, এ আয়াতে করীমাতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করছেন যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির মূর্তি বানাচ্ছি। أَجْعَلُ এর স্থলে أَخْلُقُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদি আপনারা চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন উপরোক্ত আয়াতে করীমাতে সকল আলোচনাই হাকীকত ও মাজায (প্রকৃত ও রূপক) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকৃত কর্ম সম্পাদনকারী হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতই

উপরোক্ত আয়াতে করীমাও সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম প্রকৃত সাহায্যকারী নন। বরং আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যকারী। অবশ্য এ বাক্যগুলো রূপকভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং আলোচনাও শাব্দিক। সুতরাং উসূল ও মূলনীতি এটাই হলো যে, এরূপ শব্দাবলী রূপকার্থে ব্যবহার করা জায়েয। উক্ত আয়াতে সকল শব্দই বক্তার, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই। বাক্যে হাকীকত ও মাজাযের ব্যবহার কুরআনে করিমের উদ্ধৃতিতে এটি একটি উত্তম দৃষ্টান্ত।

এটি কি মু'জিযা নয়?

এ ক্ষেত্রে কেউ একথা বলতে পারে যে, সমগ্র এ ব্যাপারটি তো সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের মু'জিযা এবং এস্তেগাসার আলোচনায় মু'জিযার কথা কেন আসবে। কেননা এখানে তো সে সম্পর্কে আলোচনাই নেই। এর সরাসরি উত্তর এটা যে, "মু'জিযা তো রোগীদের আরোগ্য হয়ে যাওয়াটাই, আরোগ্য দানের সম্বন্ধ তাঁর নিজের দিকে করাটা নয়।" মূলকথা হচ্ছে এটাই যে, অস্বাভাবিক কর্মগুলোকে তাঁর নিজের দিকে সম্পর্কিত করাটা মাজায। আর আরোগ্য দান বা রোগ হওয়াটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকেই হয়। যখন এ কথাটি দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত যে, জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠরোগকে আরোগ্যকারী আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাই। তাহলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কেন এটা ফরমালেন যে, "আমি দিচ্ছি"? এরূপ বলাটাই সমীচীন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমার হাত বুলানো দ্বারা

মাতৃগর্ভের অন্ধকে দৃষ্টি দান করেন এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করেন। এটা বললেও তাঁর বৈশিষ্টময় মু'জিযা হওয়া তখনও কোন হেরফের হতো না। কিন্তু তিনি রূপকার্থে এ সকল কথার সম্বন্ধ নিজের দিকে করেছেন।

চতুর্থ উক্তিটি তিনি করেছেন এভাবে- وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ "এবং আমি মৃতকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে জীবিত করি।" এখানে তো সমাপ্ত হয়ে গেছে। এরূপ বলেননি যে, তোমরা মৃত নিয়ে এসো, আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব, আল্লাহ আমার দোয়ার কারণে জীবিত করে দেবেন। বরং এরূপ বলেছেন, "আমি মৃতদেরকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে জীবিত করি।" এর অর্থ এটা হলো যে, এ সকল শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার এবং সেগুলোকে কোন মানুষের প্রতি সম্বন্ধ করা রূপকভাবে বৈধ।

উপরোক্ত আয়াতে করীমাতে সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের নিজের প্রতি এ সকল কর্মের সম্বন্ধ করা মাজাযি (রূপক) সম্বন্ধের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ। এ আয়াতের অপরাংশে তিনি بِإِذْنِ اللَّهِ এর বাক্যের মাধ্যমে প্রকৃত কর্মসম্পাদনকারী আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতকে সাব্যস্ত করেছেন।

পঞ্চম উক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এটা ইরশাদ করেছিলেন-

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ "এবং আমি তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা আহার করো। আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাখো।" এতে এরকম উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবগত করালে আমি জানি; বরং বলেছেন, أُنَبِّئُكُمْ "আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি।" এ বাক্যে সুস্পষ্টভাবে ইলমে গায়েব, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবগত করানো ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম এরূপ বলেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে জানিয়ে দেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ব্যাপার এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই অবহিত করেন। কিন্তু তিনি এ কথাটি নিজস্ব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেননি এবং রূপকভাবে এই গায়ব এর সম্পর্ক নিজের দিকে করেছেন। এতে এটাই সুস্পষ্ট হলো যে, গাইরুল্লাহর প্রতি ইলমে গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান) এর সম্পর্ক করা রূপকভাবে বৈধ নতুবা আল্লাহর রাসূল হতে একথা কখনও প্রকাশ হতো না।

সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম স্বীয় কওমের সম্মুখে নবুওয়াতের দাবীর ধারাবাহিকতায় যে সকল ঘোষণা দান করেছেন, বর্তমানকালের নাম সর্বস্ব একত্ববাদীদের জ্ঞান অনুযায়ী তার সবই শিরকের গণ্ডির বাইরে যাবে না।

এরূপ চিন্তাধারণার কারণে তো আম্বিয়ায়ে কেরাম যারা একনিষ্ঠভাবে সার্বক্ষণিক তাওহীদের পয়গাম নিয়ে মানবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁদের নবুওয়াতের মর্যাদাও ছিন্নভিন্ন হওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট থাকেনা এবং তাঁরাও শিরকের ফতোয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর শিরকের ফতোয়া?

সূরা আলে ইমরানের উপরোক্ত আয়াত মুবারকে তো সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি, মাটি দিয়ে পাখীর মূর্তি বানিয়ে তাতে প্রাণ নিক্ষেপ করি ইত্যাদি। কিন্তু নিম্নে বর্ণিত আয়াতে করীমাতে তো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর এ কর্মের সত্যায়ন করছেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ۝

"এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মাটির কাদা থেকে পাখীর আকৃতির ন্যায় (মূর্তি) বানাতে।"[৬৪]

আল্লাহ্ তা'আলা এটা ইরশাদ করেননি যে, হে ঈসা আলাইহিস সালাম আমি তোমার জন্য মাটির পাখি বানিয়েছি এবং জীবিত করে দিয়েছি, তোমার জন্য জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান করেছি, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা একনিষ্ঠ একত্ববাদের বাহক, সহজ সরল একত্ববাদীদের মনোবাসনা অনুযায়ী হাকীকতের উপর প্রতিষ্ঠিত এ বাচনভঙ্গিকে নিজের দিকেও সম্বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেই খালেক ও মালিক আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۝

"অতঃপর তুমি তাতে ফুঁক দাও, তখন তা (মূর্তিগুলো) আমার নির্দেশে পাখী হয়ে যাবে।"[৬৫]

---

৬৪. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১০

৬৫. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১০

রূহ ফুঁৎকার করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাজ

এটি একটি সর্বজন মান্য সত্য যে, কারো মধ্যে রূহ ফুঁৎকার করা এবং প্রাণ দেওয়া জগতের স্রষ্টারই কাজ। কিন্তু তিনি স্বয়ং সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য ফরমায়েছেন-

فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴿٤﴾

"অতঃপর তুমি তাতে ফুঁৎকার দাও, তাহলে আমার নির্দেশে পাখী হয়ে যাবে।"[৬৬]

وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ﴿٥﴾

"এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মৃতকে (জীবিত করে কবর থেকে) বের (দাঁড়িয়ে) করে দিতে।"[৬৭]

এ সকল আয়াত করিমা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, এরূপ শব্দগুলো গাইরুল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা রূপকভাবে জায়েয। এ শব্দগুলো স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ব্যবহার করেছেন এবং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালামও ব্যবহার করেছেন। অথচ এরূপ শব্দাবলী আদায় করাতে তাঁরা বাধ্য ছিলেন না। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত কর্তৃক স্বীয় কালামে মজীদে এ সকল শব্দকে রূপকভাবে ব্যবহার করা শুধু রূপক অর্থের বৈধতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নয়, বরং তা সুন্নাতে ইলাহী হবার উপরও প্রমাণ স্বরূপ।

এ সকল আলোচনা থেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আসবাবের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মের কথাও বুঝা যায়। অর্থাৎ 'মা ফাউকাল আসবাব' (মাধ্যম উর্ধ্ব বিষয়) এ বাক্য যদিও সরাসরি বান্দা ও মখলুকের প্রতি সম্বন্ধিত হয়, তবুও প্রকৃত কর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকেই মানতে হবে, কেননা প্রকৃত কর্ম সম্পাদনকারী তিনিই।

তৃতীয় আপত্তি

অন্যের কাছে এস্তেগাসাতে গায়েবী শক্তির আভাষ বিদ্যমান

এস্তেগাসা বিল গাইর (অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া) শিরক সাব্যস্ত করার তৃতীয় কারণ এটা বর্ণনা করা হয় যে, দূর থেকে সাহায্য চাওয়া আসবাব

[৬৬]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১০
[৬৭]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১০

উর্ধ্বের বিষয় (مافوق الاسباب) এবং আল্লাহ ভিন্ন যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে এ আমল দ্বারা তাঁর গায়েবী শক্তি ও কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়। যখন তিনি তাকে দূর থেকে আহ্বান করলেন, যেন তিনি এ আকীদা রাখেন যে, তার কাচে গায়েবী সর্বোচ্চ শক্তি এবং ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের আকীদা রাখা শিরক।

মনগড়া আকীদাগত ফিতনার খণ্ডন

মনগড়া এলমী ভুলভ্রান্তি এই মাসআলাকে আরও জটিল করে রেখেছে। এটা ধারণা করা সরাসরি ভুল। কেননা যে বিষয়টিকে এখানে 'গায়েবী শক্তি' নাম দেওয়া হচ্ছে, মূলত তা রূহানী ক্ষমতা যা আল্লাহ্ তা'আলা আপন প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাদেরকে দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দানকৃত এই রূহানী শক্তি ও ক্ষমতাকে مطلق قوت مقدره (সাধারণ কুদরতী শক্তি) নাম দিয়ে এক বিরাট আকীদাগত ফিতনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। 'গায়েবী শক্তি'র প্রকৃত অর্থ সেটা মোটেই নয়, যা সাধারণভাবে এস্তেগাসার খণ্ডনের বেলায় বর্ণনা করা হয়। কেননা আমরা দেখছি যে, এ ধরনের শক্তি তো আজ সকল সাধারণ মানুষ এমনকি অমুসলমানদের কাছে ভালভাবে অর্জিত আছে। 'গায়েবী শক্তি'র প্রসঙ্গে আমরা বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ থেকে ইন্টারনেট এর দৃষ্টান্ত দেয়া উপযোগী মনে করছি। মৌলিক উৎকর্ষের এই বিজ্ঞানের দুনিয়ায় যেখানে Global village এর ধারণা প্রকৃত রূপ পাচ্ছে, কম্পিউটারের জগতে ব্যবধান হ্রাস পেয়ে গেছে। এক কোটির মত ল্যাপটপ কম্পিউটারের নেটওয়ার্কযুক্ত ইন্টারনেট গোটা দুনিয়াকে সরিষার দানার মতো একত্রিত করে দিয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের অবস্থা এরূপ যে, বর্তমান যুগের সাধারণ মানুষও বন্ধ কক্ষে বসে স্বীয় হাতের তালুতে বিদ্যমান সরিষা দানার মতো সমগ্র দুনিয়া প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। এখানে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, ইন্টারনেট এবং এর সাথে সংযুক্ত অসংখ্য কম্পিউটারের অনুভূতিহীন মেশিনারী যন্ত্রপাতি কী গায়েবী শক্তির বাহক? প্রশ্ন শুধু এটাই যে, আলোচনা মিশ্রণ করার অভ্যাসযুক্ত চিন্তার লোকেরা মানবীয় ক্ষমতায় আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অর্জিত শক্তিকে তো গায়েবী শক্তি এবং শিরক সাব্যস্ত করে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত রূহানী শক্তিকে অস্বীকার করার জন্য ভিত্তিহীন পন্থায় তাকে গায়েবী শক্তি সাব্যস্ত করে শিরক প্রমাণ করাতে চেষ্টারত দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের বদৌলতে অর্জিত সুবিধাদিতে অসম্ভব জিনিস সম্ভব হয়ে

যাওয়া এবং ইন্টারনেটের সাহয্যে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে প্রদর্শিত ঘটনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সমগ্র দুনিবাসীর অবগত হতে পারা যদি তাওহীদের পরিপন্থী না হয়, তাহলে রূহানী আসবাবের সম্ভাব্যতার প্রকাশও শিরককে কখনও আহ্বান করে না।

কাফের মুশরিকদের আবিষ্কারের মাধ্যমে অর্জিত শক্তি যদি শিরকের মাধ্যম না হয়, তাহলে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দানের দ্বারা অর্জিত রূহানী ক্ষমতা প্রয়োগকে আম্বিয়ায়ে কেরাম, সুলাহায়ে কেরামের প্রতি সম্পর্কিত করাকে কিভাবে শিরক বলা যাবে? বর্তমানকালের মৌলিক উন্নতির ক্ষমতা স্বীয় স্থানে রাখুন। কিন্তু তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের ক্ষমতা, তাঁদের রূহানী উন্নতি এবং পূর্ণতার বদৌলতে এ অবস্থানের চেয়ে বহুগুণ উর্ধ্বে। এই রূহানী উন্নতির বদৌলতে হযরত গাউসে আ'যম সৈয়্যদুনা আবদুল কাদের জীলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমাচ্ছেন-

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللهِ جَمْعًا ۔ كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ

অনুবাদ : আমি আল্লাহ তা'আলার পুরো সাম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টি ফেলি, সেটা আমার চোখে সরিষার দানা বলে মনে হয়েছে।

একটি সন্দেহের অপনোদন

এখানে কিছু লোককে এ ধারণা করতেও দেখা যায় যে, যখন কাউকে দূর থেকে কোন কাজের কথা বলা হবে, তখন এর অর্থ হলো যে, যাকে বলা হচ্ছে সে দূরের স্থান সম্পর্কে অবগত। অর্থাৎ অমুক আহ্বানকারী এবং সে আহ্বানকারী সম্পর্কে জানেন। এ হিসেবে এতে এলমে গায়েবও পাওয়া গেল এবং যেহেতু এলমে গায়েবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বও রয়েছে, তাই এ দুটো জিনিসের কারণে এটা শিরক ও না-জায়েয। এই সংমিশ্রিত আলোচনার উত্তর একেবারে সহজ যে, যেখানে আমরা বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের দ্বারা অর্জিত উপকারসমূহে এরূপ এলম মানুষকে দানকৃত দেখছি, সেখানে কালামে মজিদ ফুরকানে হামীদেও এ দুটো বিষয় গাইরুল্লাহর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা শিরকের সাথে মিশ্রিত হবার পরিবর্তে মহান রবের বাণী। অর্থাৎ এতে দূর থেকে জানা এবং কাজ করার সামর্থ দুটোর উল্লেখ রয়েছে। 'সূরা নমল " এ সৈয়্যদুনা সুলায়মান আলাইহিস সালাম নিজ সভাসদদের সাথে যে কথোপকথন করেন, তাতে ইরশাদ করেছেন-

قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

"হে সর্দারগণ ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার সিংহাসন আমার সম্মুখে নিয়ে আসবে, সে অনুগত হয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হবার পূর্বে।"[৬৮]

সম্রাজ্ঞী বিলকিসের সিংহাসন সৈয়্যদুনা সুলায়মান আলাইহিস সালামের রাজ দরবারে থেকে নয়শত মাইল দূরে ছিল, যা সভাসদদের কেউ কোনদিন দেখেওনি। তা সত্ত্বেও কেউ তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করেননি যে, হে সুলায়মান আলাইহিস সালাম ! সিংহাসন তো শত শত মাইল দূরে অদৃশ্য পর্দায় বিদ্যমান এবং আপনি তা আপনার দরবারে হাজির করাটা কামনা করছেন। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখেন যে, আমরা এখানে বসে দূরের জিনিসের ব্যাপারে জ্ঞান রাখি ? এবং আমাদের কাছে এলমে গায়েব রয়েছে ?

মখলুকের কাছে কী দূরের এলম থাকতে পারে?

যদি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এ আকীদা পোষণ করতেন যে, ৯০০ মাইল দূরে অবস্থিত সিংহাসন সম্পর্কে তাঁর সভাসদের কারো কাছে এ এলম নেই যে, তা কোথায় পড়ে আছে এবং তা কিভাবে এতদূর আনা যাবে? তাহলে তিনি তাদেরকে কখনও জিজ্ঞাস করতেন না যে, তা কে আনবে? বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে নিবেদন করতেন যে, হে আল্লাহ! রাণী বিলকিসের সিংহাসন আমার কাছে পৌছিয়ে দিন। কেননা তুমিই অশেষ ক্ষমতাবান।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে যে, আমরা কুরআন মজিদ থেকে এ শিক্ষা পাই যে, দূরের জিনিসের ইলম অর্জন হওয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয় না। অতঃপর যদি সুলাইমান আলাহিস সালাম এটা ধারণা করে নেন এবং এর ভিত্তিতে সভাসদদেরকে সিংহাসন হাজির করার নির্দেশ দেন এবং তা সত্ত্বেও মুশরিক হবেন না। যদি বর্তমানকালের মুসলমানগণ একথা বিশ্বাস করেন যে, দাতাগঞ্জে বখশ আলী হাজভীরী, গাউসে আ'যম শায়খ সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী, হযরত সুলতানুল আরেফীন সুলতান বাহু রহমতুল্লাহি আলাইহিম এবং অন্যান্য আউলিয়ায়ে কামেলীন এবং সালেহীনে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন আমাদেরকে দেখেন এবং আমাদের বিপদ অবস্থা

[৬৮]. আল-কুরআন, সূরা নমল, আয়াত : ৩৮

সাহায্য করার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শক্তি রাখেন। তাহলে এটা কিভাবে শিরক হবে? যে সকল কারণের ভিত্তিতে সৈয়্যদুনা সুলাইমান আলাইহিস সালামের বেলায় শিরক সাব্যস্ত হতে পারেনি, সে সকল কারণে এখানেও শিরক হবে না। কেননা আউলিয়া কেরামকেও কশ্‌ফ ওই মহান সত্তা দান করেছেন, যিনি সুলায়মান আলাইহিস সালামের সভাসদ বিশেষত আসিফ বরখিয়াকে দান করেছিলেন। আজও যখন সর্বশক্তিমান সেই সত্তাই, যিনি সৈয়্যদুনা সুলায়মান আলাইহিস সালামের পুণ্যময় যুগেও ছিলেন, সুতরাং আজও আহকাম সেভাবেই জারি হবে। দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন ধারণা ও এতেকাদ সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন?

ফারুকে আযমের কাশ্‌ফ

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাদেরকে দানকৃত রূহানী শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে অজানা জিনিস ও স্থান সম্পর্কে অজ্ঞতার পর্দা সরে যায়। এটা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের বিশেষ দানের অন্তর্ভুক্ত রূহানী ফয়েযেরই পরিপূর্ণতা যে, তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাপূর্ণ সংস্পর্শে ধন্য সাহাবায়ে কেরাম মৌলিক মাধ্যম এখতিয়ার করা ব্যতীত হাজার মাইল দূরে অবস্থানতর ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিকে সরাসরি নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম ছিলেন। সৈয়্যদুনা সারিয়া ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেনাপতিত্বে ইসলামী সৈন্যবাহিনী ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ ছিল। শত্রুবাহিনী এমন পাঁয়তারা করলো যে, ইসলামী বাহিনী মন্দভাবে তাদের ভিড়ে এসে গেল। ঠিক সেই সময় খলিফাতুল মুসলেমীন সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা মুনাওয়ারায় মিম্বরের উপর জুমা'র খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি রূহানী ক্ষমতার বদৌলতে যুদ্ধের ময়দানের নকশা তাঁর দৃষ্টির সামনে ছিল। খুতবার মধ্যখানে উচ্চ আওয়াজে আহ্বান করলেন-

يَا سَارِيَةُ الْجَبَلِ.

"হে সারিয়া পাহাড়ে উঠ।"[৬৯]

[৬৯]. ১. মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃষ্ঠা : ৫৪৬
২. আবু নায়ীম : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, পৃষ্ঠা : ৫০৭
৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, খন্ড : ১২, হাদীষ : ৩৫৭৮৮

একথা ইরশাদ করে তিনি পুনরায় আগের মত খুতবাদানে লিপ্ত হয়ে গেলেন। হাজার মাইল দূরে অবস্থিত মসজিদে নববীতে জুমার খুতবাও দিচ্ছিলেন এবং নিজের প্রেরিত সেনাপতিকে যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি নির্দেশনাও দিচ্ছিলেন। না তাঁর নিকট কোন রাডার সিস্টাম ছিল, না মোবাইল ফোন যার মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দানের অবস্থার তাৎক্ষণিক সংবাদ অবগত হতে পারেন। এটা শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দানকৃত রূহানী শক্তি ও ক্ষমতা ছিল, যার বদৌলতে অভ্যন্তরীণ চক্ষু সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিল। হযরত সারিয়া ইবনে জবল রাদিয়াল্লাহু আনহু সৈয়্যদুনা ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর পয়গাম প্রাপ্ত হলেন এবং সে অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে পাহাড়ের দিকে আরোহন করে বিজয় লাভ করলেন। শত্রুর আক্রমণ বিফল হলো। এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনীর প্রতি আক্রমণের কারণে বিজয় তাঁদের পদচুম্বন করল।

কাশ্‌ফ এবং ইলমে গায়েব এর পার্থক্য

এখানে একটি ভুলের অপনোদন করতে যাচ্ছি যে, কাশফ ও ইলমে গায়েব দুটো আলাদা জিনিস। ইলমে গায়েবের বিপরীতে কাশফের মধ্যে শুধু কোন অজানা জিনিস হতে পর্দা উঠিয়ে দেয়ার অর্থ পাওয়া যায় এবং এটা শুধু মখলুকের জন্যই সম্ভব। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের মহান সত্তার জন্য কাশ্‌ফ নামের কোন জিনিস নেই। কেননা তিনি "আলেমুলগায়ব ওয়াশশাহাদাত" (অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল কিছু সম্পর্কে অবগত)। যেহেতু তাঁর কাছে কোন জিনিসের জন্য পর্দাই নেই, সুতরাং কাশফের মাধ্যমে পর্দা উঠার প্রশ্নই আসেনা। কাশফের সম্বন্ধ আউলিয়াল্লাহর দিকে হবার কারণে আল্লাহর নেক ও বুযর্গ ব্যক্তিদের জন্য সেই জিনিস সাব্যস্ত হচ্ছে, যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা স্বয়ং সত্তায় শিরক। সুতরাং এমন জিনিস যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব উহার সম্বন্ধ গাইরুল্লাহর দিকে করলে শিরকের সম্ভাবনা কিভাবে থাকে? আউলিয়াল্লাহদের জন্য গায়েবের জিনিস পর্দাবৃত থাকে এবং আল্লাহ্ সেগুলোর পর্দাসমূহ তুলে দেন। এটাই তো মূল তাওহীদ। শিরকের অপবাদ তো শুধু সে সময় দুরস্ত সাব্যস্ত হতে পারে যখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের গুণাবলী ও মা'বুদ হওয়াটা গাইরুল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করা হবে। জমিন, আসমান, আসমানী জগতসমূহের কোথাও এমন কোন জিনিসই নেই, যা আল্লাহর কাছ থেকে গোপন হয়। যে সকল জিনিস তাঁর বান্দাদের জন্য

গায়েব, তিনি সে সবও ভালভাবে অবগত এবং যা দৃশ্যমান তাও তাঁর ইলমে বিদ্যমান। আল্লাহর বাণী রয়েছে-

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আসমান-জমিনে কোন জিনিসই গোপন নেই।"[৭০]

এ আয়াত মোবারকের আলোকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য কাশফের বিশ্বাস রাখা অকাট্যভাবে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত এবং এলমে গায়েবকে সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করে রাখার নামান্তর, যা নিশ্চিতভাবে তাওহীদের দাবী হতে পারে না। কেননা কাশফের মধ্যে একটি গোপন হাকীকতকে দৃশ্যমান করার অর্থ পাওয়া যায় এবং আল্লাহর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। আম্বিয়া ও আউলিয়াদের জন্য পর্দা থাকার বিশ্বাস ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁদেরকে কাশ্‌ফ দান করেছেন এবং পর্দাসমূহ উঠিয়ে নেয়ার কারণে তাঁরা দূরের ও নিকটের সকল জিনিস অবগত হন। (ইলমে গায়েবের বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য লিখকের কিতাব "কুরআন ওয়া সুন্নাত আউর আকীদা-ই ইলমে গায়েব" বইটি দেখুন।)

নবী আলাইহিস সালামের প্রশ্ন করাটা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির কুদরত থাকার প্রমাণ

কুরআন মজিদে বর্ণিত উক্ত ঘটনায় সৈয়্যদুনা সুলাইমান আলাইহিস সালাম স্বীয় সভাসদগণের কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, রাণী বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে এসো এবং সাথে এ শর্ত দিলেন যে, قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (সে আমার অনুগত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হবার পূর্বে)। কওমে সাবার রাণী এবং তাঁর সাথে আরও অনেক লোক হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য রওয়ানা হয়েছেন এবং মুসলমান হবার জন্য আসছেন। এদিকে তিনি ইচ্ছা করছেন যে, তাঁদের পৌঁছার আগেই যেন সিংহাসন এখানে পৌঁছে যায়।

যদি হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম গাইরুল্লাহ্'র (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) জন্য দূরের জিনিস জানতে পারার এবং নিয়ে আসতে পারার শক্তি ও কুদরত থাকার আকীদা পোষণ না করতেন, তাহলে তিনি কখনোই এরূপ প্রশ্ন

[৭০]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫

করতেন না; বরং সভাসদও বলে দিতেন যে, হে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম ! মখলুকের জন্য এরূপ কাজ আঞ্জাম দেয়া কিভাবে সম্ভব ? আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করুন, শুধু তিনি এই অস্বাভাবিক বিষয়ের কুদরত রাখেন। কিন্তু সভাসদদের মধ্যে একজনও এরূপ অসৌজন্যমূলক কথা বলেননি। উত্তরে একজন জ্বীন দাঁড়িয়ে বলল-

أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ ۝

"আমি তা আপনার সমীপে নিয়ে আসতে পারব। আপনি স্বীয় স্থান থেকে দণ্ডায়মান হবার আগে এবং নিশ্চয় আমি তাতে (আনতে) সামর্থবান ও আমানতদার।"[৭১]

এখানে এ কথাও লক্ষ্যণীয় যে, যে জিনিস জ্বিনদের জন্য বৈধ, তা আল্লাহর প্রিয় এবং তাঁর দরবারে অবনত বুযর্গ লোকদের জন্য কিভাবে শিরক হতে পারে ? শিরক তো আল্লাহ তা'আলার সে সকল গুণাবলীকে গাইরুল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করলে হবে, যা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্যই নির্দিষ্ট এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্ভব হতে পারে না।

সৈয়্যদুনা সুলায়মান আলাইহিস সালাম এ জ্বিনের উত্তর কবুল করলেন না। তারপর মানুষের মধ্যে একজন এমন বান্দা যার কাছে কিতাবের ইলম ছিল, যিনি আলেম ও রূহানী শক্তি সম্পন্ন ছিলেন. তিনি দাঁড়িয়ে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের সমীপে এরূপ নিবেদন করলেন-

أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ

قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى ۝

"আমি তা আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বে আপনার কাছে আনতে পারব। তারপর যখন সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) সেটা (সিংহাসন)কে নিজের সামনে বিদ্যমান দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার মহান রবের অনুগ্রহ।"[৭২]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে একদিকে এমন মখলুক (জ্বিন) এর উল্লেখ আছে যার কাছে স্বীয় শক্তিসামর্থের আনন্দ রয়েছে, যার শক্তিতে সে শত

[৭১]. আল-কুরআন, সূরা নমল, আয়াত : ৩৯
[৭২]. আল-কুরআন, সূরা নমল, আয়াত : ৪০

মাইলের দূরে পড়ে থাকা সিংহাসনকে মজলিশ সমাপ্ত হবার আগে উপস্থিত করার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। আর অপরদিকে একজন আল্লাহ্ওয়ালার (মানুষ) মর্যাদা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সে এ কাজটি চোখের পলক পড়ার আগেই আঞ্জাম দেয়ার যোগ্যতা রাখেন। এমনি মুহূর্তে সৈয়্যদুনা সুলায়মান আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বললেনঃ

لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

"যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, না অকৃতজ্ঞ হই। বস্তুতঃ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে স্বীয় কল্যাণের জন্যই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করে, আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে আমার রব বেপরোয়া, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। নিঃসন্দেহে আমার রব অমুখাপেক্ষী, দয়ালু।"[৭৩]

গায়েবী শক্তির সন্দেহের উপর ভিত্তি এই অভিযোগকে কোন কোন সময় এভাবেও পেশ করা হয় যে, বান্দার কাছ থেকে বান্দার সামর্থের বর্হিভূত জিনিস চাওয়া দুরস্ত নেই; বরং এস্তেগাসার অবৈধতা সাব্যস্ত করার জন্য এটা ধারণা করা হয় যে, আম্বিয়া, সুলাহা ও আউলিয়াদের কাছে বান্দার সামর্থের বর্হিভূত জিনিস (এমন জিনিস যা বান্দার কুদরতে নেই, বরং শুধু আল্লাহর কব্জা ও কুদরতের অধীন) চাওয়া শিরক। মূলত এ ধারণা এস্তেগাসার ধরনটি বুঝতে না পারার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। কেননা কোন মুসলমানই এস্তেগাসা করার সময় কখনও এ আকীদা নিজের অন্তরে পোষণ করে না যে, মাযাযী সাহায্যকারী (অর্থাৎ নবী অলীগণ) নিজ থেকেই আমাদেরকে সাহায্য করবেন। বরং আমাদের উদ্দেশ্য ধারণা এটা হয় যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের হাজত পূরণ সবব ও অসীলা হবেন, যেমনটি অন্ধ সাহাবীর ঘটনা ও বৃষ্টি প্রার্থনার বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। উপরোক্ত সাহাবাগণ আল্লাহ তাআলাকে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সরওয়ারে কায়েনাতের সত্তার গুণাবলীকে অসীলা হিসেবে মেনে নিয়ে স্বীয় হাজত পূরণের জন্য নিবেদন করেছেন। এর প্রেক্ষিতে মহান একত্ববাদী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি তাওহীদের রহস্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত, তিনি সে সকল

[৭৩]. আল-কুরআন, সূরা নমল, আয়াত : ৪০

সাহাবাদেরকে নিষেধ করা এবং শিরকের শব্দাবলি উচ্চারণ থেকে বিরত থাকার স্থলে তাদের জন্য দোয়া করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চাওয়া পূর্ণ করে দিয়েছেন। যদি বান্দার সামর্থের বহির্গত ব্যাপারে গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক হতো তাহলে-

প্রথমত ঃ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ধরনের আবেদন করতেন না।

দ্বিতীয়ত ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিরক সম্পর্কে সাবধান করে সব সময়ের জন্য এ ধরনের কোন কিছু প্রার্থনা করা থেকে নিষেধ করে দিতেন।

তৃতীয়ত ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের প্রতি সাহায্য করা থেকে নিষেধ করতেন এবং শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতেন।

সাহাবায়ে কেরামের এস্তেগাসা করা, উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল এবং আল্লাহ্ তা'আলা এই আমল থেকে নিষেধ না করা এ তিনটি জিনিস মিলে এটা প্রমাণ করে যে, এস্তেগাসা শুধু বৈধ নয় বরং সুন্নাতে সাহাবা এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। মু'জিযা চাওয়াও এ বিষয়ের অধীনে এসে যায়। যখন কাফের ও মুশরিকরা তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অলৌকিক কার্যাবলী মু'জিযা স্বরূপ কামনা করেছে, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সব কর্মকে শিরক সাব্যস্ত করার পরিবর্তে স্বীয় পবিত্র হস্তে কামনাকৃত মু'জিযাসমূহ (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ইত্যাদি) প্রকাশ করে দেন। যদি বান্দার শক্তির বর্হিভূত এসব কর্ম শিরক হতো তাহলে নবীয়ে আখেরুজ্জমান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এগুলো কিভাবে প্রকাশ হওয়া সম্ভব ছিল? যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম শিরক নয় (এবং এমন ধারণা করাও ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়) তাহলে উম্মতের সুন্নাতে সাহাবার উপর আমল করতে গিয়ে এরূপ কর্ম চাওয়াটা কিভাবে শিরক হতে পারে ?

মুসলমানরা সর্বদা আম্বিয়া ও আউলিয়াদের কাছে এস্তেগাসা করার সময় এই আকীদা পোষণ করে যে, তাঁরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ ও দোয়া করে আমাদের হাজত পূরণ করে দেন। এটাই আমাদের আকীদা এবং এটাই সমস্ত উম্মতের আকীদা। যদি কেউ এরূপ এস্তেগাসা করে যে, হে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে আরোগ্য দান করুন এবং আমার ঋণ

শোধ করে দিন। তাহলে এর অর্থ এটাই হয় যে, রোগের আরোগ্য এবং ঋণ শোধের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করুন। দোয়া ও সুপারিশের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাহবুব বান্দাদেরকে শক্তি দান করেছেন। এ প্রকার উক্তিসমূহের ব্যাপারে এ কর্মের সম্পর্ক মাজাযে আকলী (বুদ্ধিগত রূপকার্থ) হিসেবে করা হয়েছে এবং এতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং কুরআন মজিদে ইরশাদ করেছেন-

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴿٣٦﴾

"পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন ওই সব বস্তু থেকে, যেগুলোকে ভূমি উৎপন্ন করে।"[৭৪]

কুরআন মজিদে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদের জন্মানোর সম্বন্ধ ভূমির দিকে করেছেন। অথচ উদ্ভিদ জন্মানোর শক্তি ভূমির নেই। তা একাজে শুধু অসীলা ও মাধ্যম হয়ে থাকে। এ আয়াত মুবারক থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, অসীলা ও মাধ্যম হলে সে সকল জিনিসকে কর্তা হিসেবে উল্লেখ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে মাজাযে আকলী'র (বুদ্ধিগত রূপকার্থ) কারণ সঠিক অর্থ গ্রহণের জন্য বিদ্যমান থাকে। কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় এ অর্থ রয়েছে এবং এতে কোন অবৈধ কথা নেই। মুসলমানদের এ অর্থে ব্যবহৃত বাক্য এমনভাবে শিরক থেকে শূন্য, যেমনিভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কালামে মজিদ এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শিরক শূন্য।

চতুর্থ আপত্তি

আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই

কুরআন মজিদের ওই আয়াত মুবারকসমূহ যেগুলোতে গাইরুল্লাহ্র কাছে অভিভাবকত্ব ও সাহায্য চাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে অপরের কাছে সাহায্য চাওয়া (এস্তেগাসা বিল গাইর) কে নিষেধ করা হয় এবং এটা বলা হয় যে, অভিভাবকত্ব ও সাহায্যের হকদার শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এবং আল্লাহ্র হককে অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা শিরক। যেমনিভাবে কুরআন মজিদে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য ঘোষণা রয়েছে-

[৭৪]. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৩৬

1- وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

"এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের না আছে কোন অভিভাবক আর না আছে কোন সাহায্যকারী।"[৭৫]

2- وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

"এবং তারা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কোন অভিভাক পাবেনা, না কোন সাহায্যকারী।"[৭৬]

3- وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

"এবং তিনিই কর্মব্যবস্থাপক, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।"[৭৭]

4- مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

"আল্লাহ্ তেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী।"[৭৮]

5- وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

"আর আল্লাহ্ যথেষ্ট অভিভাবকরূপে এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট সাহায্যকারীরূপে।"[৭৯]

6- وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴿١٠﴾

"এবং (প্রকৃতপক্ষে তো) আল্লাহ্র দরবার ব্যতীত অন্য কোন সাহায্য নেই।"[৮০]

7- وَٱجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾

"এবং আমাকে তোমার নিকট থেকে সাহায্যকারী বিজয় শক্তি দাও।"[৮১]

8- وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

[৭৫]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১০৭
[৭৬]. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ১৭
[৭৭]. আল-কুরআন, সূরা শুরা, আয়াত : ২৮
[৭৮]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২০
[৭৯]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৪৫
[৮০]. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ১০
[৮১]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৮০

"এবং আপনার রব যথেষ্ট হিদায়ত করা ও সাহায্যদানের জন্য।"[৮২]

উল্লেখিত সকল আয়াতের উদ্দেশ্যমূলক অর্থকে হাকীকী অর্থের উপর কিয়াস করে এই দলীল গ্রহণ করা হয় যে, এ সকল আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য نَصِيْرٌ ، سُلْطَانٌ ، وَلِيٌّ এবং هَادِيٌ সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর এ সকল গুণাবলীতে অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা শিরক।

এরূপ দলীল গ্রহণ বাতিল

কুরআনে হাকীমে কয়েকটি শব্দের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার প্রতি করা মানে কখনও এটা নয় যে, এ সকল শব্দের সম্বন্ধ গাইরুল্লাহর প্রতি করা শিরক সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। সুতরাং কুরআন মজিদে যেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য وَلِيٌّ ও نَصِيْرٌ শব্দ এসেছে, সেখানে তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যও রূপকভাবে এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানে অহেতুক দীর্ঘসূত্রিতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুধু وَلِيٌّ ও نَصِيْرٌ কে অন্তর্ভুক্তকারী আয়াতগুলো তুলে ধরছি। অথচ এসব ব্যতীত আল্লাহর আরও অনেক গুণাবলীতে (যেমন- سَمِيْعٌ ، شَهِيْدٌ ، بَصِيْرٌ ইত্যাদি) ও কুরআন মজিদে আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের জন্য সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

1- وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে কোন ত্রাণকর্তা দাও এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে কোন সাহায্যকারী প্রদান করো।"[৮৩]

2- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ﴿٥٥﴾

"নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ।"[৮৪]

3- وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

[৮২]. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত : ৩১
[৮৩]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫
[৮৪]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ৫৫

"এবং যদি তাঁর ব্যাপারে তোমরা জোট বাঁধো, (একে অপরকে সাহায্য করো) তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী এবং জিবরাঈল ও সৎকর্ম পরায়ণ মু'মিনগণ। এবং এরপর ফিরিশতাগণ সাহায্যকারী রয়েছেন।"[৮৫]

4- وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴿٧١﴾

"এবং মু'মিন নর ও মু'মিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী।"[৮৬]

এ সকল সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত হয় যে, وَلِيٌّ ও نَصِيْرٌ এবং এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ যেগুলো কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত হিসেবে বর্ণিত আছে, সে শব্দগুলো আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য রূপকার্থে শুধু জায়েয নয়; বরং রাব্বুল ইজ্জতের সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলার মহান সুন্নাতকে শিরকের নাম দেওয়া ইসলামী তা'লিমাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর। ইসলামী আহকাম কখনও এ বিষয়ের শিক্ষা দেয় না।

পঞ্চম আপত্তি

সওয়াল ও এস্তেগাসা শুধু আল্লাহ্র কাছেই বৈধ

এস্তেগাসাকে অস্বীকার করার জন্য সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদিস মুবারক দ্বারা একটি ভুল দলীল দেওয়া হয়, যাতে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সওয়াল করা এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ বিদ্যমান। হাদিসে মুবারকের ভাষ্য নিম্নরূপ-

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ.

"যখন তুমি সওয়াল করবে, তবে আল্লাহর কাছেই সওয়াল করো এবং যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। জেনে রেখো যে, যদি সকল উম্মত মিলিত হয়ে তোমারে উপকার করতে চায়, তবুও আল্লাহর তাকদীরের বিপরীতে তা করতে পারবে না।

[৮৫]. আল-কুরআন, সূরা তাহরীম, আয়াত : ৪
[৮৬]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৭১

(এভাবে) সমস্ত উম্মত একত্রিত হয়ে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবুও তাকদীরে ইলাহীর বিপরীতে সফল হতে পারবে না। (কেননা তাকদীর লেখকের) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং লেখাসমূহ শুকিয়ে গেছে।"[৮৭]

নিচে আমরা একথা ব্যাখ্যা করবো যে, এ হাদিস মুবারক থেকে এটা প্রমাণ করা যে, সওয়াল ও এস্তেগাসা শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কাছেই জায়েয এবং গাইরুল্লাহর কাছে করা সওয়াল ও এস্তেগাসা শিরকে লিপ্ত করার কারণ। একথাটি সম্পূর্ণ ভুল।

সওয়াল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ

এ বাতেল দলীল গ্রহণ দ্বারা আসবাব এখতিয়ার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং সওয়াল এস্তেআনত, এস্তেগাসা ও এস্তেমদাদ -এ বর্ণিত কুরআন ও সুন্নাহর অনেক নস অনর্থক হয়ে গেল। এরূপ দলীল গ্রহণ কুরআন হাদিস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত না হওয়া, নুযুলে কুরআনের উদ্দেশ্য বুঝতে নাপারা এবং ইসলামের শিক্ষাসমূহের হালকা অধ্যয়নের কারণেই সম্ভব। যা দ্বারা সমস্ত মুসলিম উম্মতের উপর কুফর ও শিরকের অপবাদ দেয়াই উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এ হাদিস মুবারকের উদ্দেশ্য সওয়াল, এস্তেগাসা, এস্তেআনত ও এস্তেমদাদ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে করা থেকে বিরত রাখা নয়, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যাচ্ছে। বরং এ হাদিসের উদ্দেশ্য বান্দার দৃষ্টিকে আসবাব থেকে ফিরিয়ে মুসাব্বাব এর প্রতি সম্বন্ধ করা। যাতে বান্দা এস্তেগাসার সববের (রূপক সাহায্যকারী) ধারণায় লিপ্ত হয়ে প্রকৃত সাহায্যকারীকে ভুলে না বসে। সুতরাং ইসলামী শিক্ষার আলোকে এ হাদিস শরীফের অন্য অর্থ এরূপ হবে যে, "হে বান্দা! যখন তুমি খোদার কোন মকলুকের কাছে সওয়াল, এস্তেআনত ও এস্তেগাসা করবে তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের যাত ও কুদরতে কামেলার উপর পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর করো এবং তাকেই হাকীকী সাহায্যকারী মনে করে সওয়াল করো। তোমাকে এ মাজাযী আসবাব যেন মুসাব্বিবুল আসবাব (সবর সৃষ্টিকারী) থেকে গাফেল করে না দেয় এবং তোমার জন্য যেন পর্দা হয়ে না যায়।" নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিস মুবারকে এস্তেআনত ও এস্তেগাসার সীমাবদ্ধতার ধারণা দেননি; বরং ফরমায়েছেন যে, তাকদীরে ইলাহীর বিপরীতে কোন এস্তেগাসা সম্ভব নয়। এতে আল্লাহর

[৮৭]. তিরমিযী : আস সুনান, ২/৭৪, হাদীস : ২৪৪০

দরবারে অসীলা হয়ে কারো হাজত পূরণের অস্বীকার কোথায়? আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত করা এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করার মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর একটিকে আরেকটির উপর কিভাবে তুলনা করা যাবে? হাদিস মুবারকে শেষের এ কথাকে সুস্পষ্ট করছে যে, শুধু তাকদীরে এলাহীর বিপরীতে গাইরুল্লাহর কাছে এস্তেগাসা করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই হাদিস মুবারক তাকদীরে এলাহীর হুজ্জত (দলীল)কে পরিপূর্ণ করার জন্যই বর্ণিত হয়েছে, সওয়াল ও এস্তেগাসাকে নিষেধ করার জন্য নয়। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সওয়াল করার নির্দেশ তো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। যেমন দেখুন-

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"সুতরাং তোমরা আহলে যিকর এর কাছে সওয়াল করে নাও, যদি তোমরা স্বয়ং (কিছু) অবগত না হও।"[৮৮]

উপরোক্ত আয়াতে করীমাতে মু'মিনদেরকে আহলে যিকরের নিকট প্রশ্ন করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এ আয়াতে করীমা ব্যতীত একই অর্থে বর্ণিত অসংখ্য হাদিসে নববী দ্বারাও এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ এর মানে গাইরুল্লাহর কাছে প্রশ্ন করার সাধারণ নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং এর অর্থ হচ্ছে যে, বিনা প্রয়োজনে ধনীদের কাছে লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের থেকে ধন চাওয়া এবং ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে পদমর্যাদা চাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলার কাছেই তাঁর অনুগ্রহ ও মর্যাদা চাইতে হবে। এ হাদিস মুবারক হতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সওয়াল করা নিষেধ এ দলীল নেয়া অকাট্যভাবে দুরস্ত নয়। وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ -তে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের কাছে সওয়াল বা এস্তেগাসা ও তাওয়াসসুল অবৈধ হবার কোন দলীল নেই। কারণ অসংখ্য হাদিস মুবারকাতে বর্ণিত আছে যে, সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকবার সাহাবাদেরকে সওয়াল করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং আবার তাঁদের সওয়ালের উত্তর ইরশাদ করেছেন। (এর বিস্তারিত বর্ণনা উদাহরণসহ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।) যদি গাইরুল্লাহর কাছে সওয়ালকে শিরক সাব্যস্ত করে দেয়া হয়, তাহলে শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে প্রশ্ন করা, রোগীর জন্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা চাওয়া, অভাবী ব্যক্তির সামর্থবান ব্যক্তির কাছে

[৮৮]. আল-কুরআন, সূরা নহল, আয়াত : ৪৩

সওয়াল করা এবং ঋণী ব্যক্তিকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তা ফেরত চাওয়া সব শিরক এবং নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসে যাবে।

আরও চাও

সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সৌভাগ্যবান সাহাবী সৈয়্যদুনা রবীয়া ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযু করার পানি নিয়ে তাঁকে অযু করালেন। এ খেদমতের বিনিময়ে মালেকে কওন ওয়া মকাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে হযরত রবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফরমালেন, سَلْ 'চাও, যা চাইতে ইচ্ছা করো।' এতবড় সুযোগ পেয়ে রসূলের সাহাবী সাহেবে লাউলাকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর সার্বক্ষণিক নৈকট্যের নি'আমত চেয়ে নিলেন, যা হুযুরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল করে নিলেন। হযরত রবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বর্ণনা করেছেন-

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي : سَلْ فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ، قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

"আমি রাসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি রাত অতিবাহিত করেছিলাম। (এবং শেষ রাতে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযু ও হাজত পূরণে জন্য পানি আনলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, তুমি চাও (যা চাওয়ার), আমি নিবেদন করলাম, আমি বেহেশতে আপনার (সার্বক্ষণিক) নৈকট্য চাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, আর কি চাও? আমি নিবেদন করলাম, সেটাই যথেষ্ট। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, অধিক সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।"[৮৯]

[৮৯]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুস সালাত, ১/১৯৩
২. আব দাউদ : আস সুনান, কিতাবুস সালাত, ১/১৯৪

এ হাদিস শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আপন সাহাবীকে চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যদি গাইরুল্লাহর কাছে চাওয়া নিষেধ হতো তাহলে সবচেয়ে বড় একত্ববাদী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এরূপ ফরমাতেন না। হাদিসের শেষাংশে তিনি স্বয়ং স্বীয় সাহাবীর কাছে অধিক সিজদার দ্বারা সাহায্য চেয়েছেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, গাইরুল্লাহর কাছে চাওয়া এবঙ সাহায্য কামনা করা সুন্নাতে মোস্তফা হবার ভিত্তিতে বৈধ আর এর বিপরীত ফতোওয়া দেওয়া নিঃসন্দেহে কোন একত্ববাদীর নিদর্শন হতে পারেনা। এ ধরনের মযহাবী ধ্যান-ধারণা ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হয়ে থাকে।

এস্তেগাসা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজত পূরণ এবং সাহায্য চাওয়ার জন্য প্রিয় বান্দাগণ এবং প্রিয় আমল ও কর্মসমূহের দ্বারা এস্তেগাসা করা আল্লাহর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমরা এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

১. কুরআন মজিদে আছে-

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴿٤٥﴾

"এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাও।"[৯০]

এখানে সবর ও সালাতের ন্যায় আমালে সালেহার দ্বারা সাহায্য চাওয়ার যথারীতি খোদায়ী নির্দেশনা বিদ্যমান। যাতে মু'মিনদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, সবর ও সালাতের ন্যায় আ'মালে সালেহাকে অসীলা ও মজাযী সাহায্যকারী বানিয়ে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, যিনি হাকীকী সাহায্য ও মদদদাতা, তাঁর দরবারে সাহায্য চাও।

২. এভাবে আরেকটি আয়াতে করীমা দেখুন। এতে জিহাদের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জামের সাহায্য নেবার জন্য এবং জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন-

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴿٦٠﴾

[৯০]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৫

"এবং (হে মুসলমানগণ) তাদের (মুকাবিলা করার) জন্য তোমাদের যতটুকু সম্ভব (হাতিয়ার ও যুদ্ধাস্ত্রসমূহের) শক্তি সংগ্রহ করো এবং বাঁধা ঘোড়ার দ্বারা। (খেপও)।"[৯১]

৩. এটা ব্যতীত কুরআন মজিদে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মাহবুব ও বুযর্গ বান্দা হযরত যুল ক্বারানাইন আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কুরআন সাক্ষী আছে যে, তারা শত্রুর মুকাবিলায় স্বীয় গোত্রের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। কুরআনী ঘোষণা হচ্ছে-

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴿٩٥﴾

"তোমরা স্বীয় শক্তি (অর্থাৎ মেহনত ও পরিশ্রম) দ্বারা আমার সাহায্য করো।"[৯২]

৪. সালাতুল খওফ যা কুরআন ও সুন্নাহ্র অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত তাও মাজযী এস্তেগাসার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কেননা উহার প্রবর্তনে কিছু মখলুকের গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার বিধান বিদ্যমান।

৫. হাদিস মুবারকে সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুবার মু'মিনদেরকে একে অপরের সাহায্য করা, চাওয়ার নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন-

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.

"যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের হাজত পূরণ করে, আল্লাহ স্বয়ং তার হাজত পূরণ করেন।"[৯৩]

৬. আরেকটি হাদিস শরীফে এই বিষয়টি এভাবে এসেছে-

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার কোন ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"[৯৪]

[৯১]. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০
[৯২]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ৯৫
[৯৩]. ১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মাজালিম, ১/৩৩০
২. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, ২/৩২০
[৯৪]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুয যিকির, ২/৩৪৫
২. তিরমিযী : আস সুনান, আবওয়াবুল কেরাত, ২/১১৮

৭. ইমাম হাকেম রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় 'মুস্তাদরকে' একটি হাদিস মুবারক উল্লেখ করেছেন, যাতে হুযুর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে পরস্পর সাহায্য ও হাজত পূরণ করার জন্য নির্দেশ দিতে গিয়ে এ মুবারক আমলের গুরুত্ব এভাবে বলেছেন-

لَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ.

"তোমাদের কারো জন্য আপন ভাইয়ের কাছে তার সাহায্যের জন্য যাওয়াটা এই মসজিদে দুইমাস এতেকাফ করার চেয়ে উত্তম।"[৯৫]

৮. আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের বিপদাপদ ও সমস্যা দূর করা এবং হাজত পূরণ করার জন্য বিশেষভাবে এমন মকলুক সৃষ্টি করে রেখেছেন, যারা দুঃখী মানবতার সেবা এবং তাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। হাদিস শরীফে আছে-

إِنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

"আল্লাহ তা'আলা মানুষের হাজতসমূহ এবং প্রয়োজনাদি পূরণ করার জন্য এক প্রকার মখলুক সৃষ্টি করে রেখেছি, যাতে মানুষ স্বীয় প্রয়োজনাদির (পূর্ণ করার) জন্য তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। এ সকল লোক আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ।"[৯৬]

এ হাদিস মুবারকে সরওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী "লোকেরা তাঁদের কাছে স্বীয় প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার জন্য প্রত্যাবর্তন করে।" বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এস্তেআনত ও এস্তেগাসার জন্য লোকদের সেই মখলুকে খোদার কাছে যাওয়াকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্ত াহসান বলেছেন। দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে একে হারাম বা শিরক সাব্যস্ত করাতো অনেক দূরের কথা।

৯. একই অর্থে বর্ণিত আরেকটি হাদিস মুবারক নিম্নরূপ-

[৯৫]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৪/২৭০
২. আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৩/৩৯১
[৯৬]. ১. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/১৯২
২. আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৩/৩৯০

إِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَمًا يُقِرُّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، مَا لَمْ يَمَلُّوهُمْ فَإِذَا مَلُّوهُمْ نَقَلَهَا مِنْ عِنْدِهِمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.

"আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের কাছে স্বীয় নেয়ামতসমূহ রেখেছেন। সেই বান্দারা মানুষের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করতে থাকেন, যতক্ষণ না তারা পেরেশান না হন। যখন তারা পেরেশান হয়ে যায় তখন (এই ডিউটি) অন্যদেরকে সোপর্দ করে দেওয়া হয়।"[৯৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে এটা প্রমাণিত হলো যে, মখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়া, আপন মুসলমান ভাইদের সাহায্য চাওয়া এবং এস্তেগাসার সময় তাদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর ইচ্ছা, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা। যেই আমলের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এবং তাঁর মাহবুব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং সকল মুসলিম উম্মত প্রতিটি যুগে এ নির্দেশ পালনে লাব্বাইকা বলেছেন, তা কখনও শিরক ও বিদআত হতে পারেনা। এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসগুলো এস্তেগাসার জন্য শুধু বৈধতা ও হালাল হবার নয়, বরং খোদায়ী নির্দেশনার মর্যাদা রাখে।

ষষ্ঠ আপত্তি

সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস্তেগাসার নিষেধাজ্ঞা

সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী হায়াত মুবারকাতে একজন মুনাফিক মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত এবং তাদের জন্য নানা রকম কষ্ট তৈরির কাজে লিপ্ত থাকতো। সৈয়্যদুনা সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবাদেরকে বললেন, চলো আমরা সবাই মিলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এই মুনাফিকের বিরুদ্ধে এস্তেগাসা করবো। যখন একথাটি সরওয়ারে আ'লম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন-

أَنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي إِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[৯৭]. ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৯/১৬১
২. আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৩/৩৯০

"আমার কাছে এস্তেগাসা করা যাবে না এবং শুধু আল্লাহর কাছেই এস্তেগাসা করা যায়।"[৯৮]

এ হাদিস মুবারকের অর্থ বুঝা এবং এটার প্রেক্ষাপট না জানার কারণে কেউ কেউ ধারণা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে এস্তেগাসাকে অকাট্যভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি কেউ গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

হাদিস মুবারকটির সঠিক অর্থ

এই একটি হাদিস মুবারককে উহার হাকীকী অর্থে ব্যবহার করে অসংখ্য আয়াত, হাদিস এবং আমলে সাহাবার বিরোধিতা করা হয়েছে। যে সকল আয়াত ও হাদিসে সুস্পষ্ট শব্দে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের কাছে এস্তেগাসা করার নির্দেশ পাওয়া যায় (যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি বিস্তারিত বর্ণনা আমরা উপরে করে এসেছি) সেই হাদিসের হাকীকী অর্থের উপর আমল করার সময় এ সকল আয়াত ও হাদিসকে শুরু থেকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখতে হবে। ইসলামী শরিয়তের সর্বজনগ্রাহ্য মূলনীতি হচ্ছে যখন কোন হাদিস কুরআন মজিদ কিংবা অন্যান্য মুতাওয়াতির হাদিসের বিপরীত আহকাম প্রকাশ করবে, তখন সেগুলোর মধ্যখানে সমতা করার চেষ্টা করতে হবে। যদি হাকীকী অর্থের দ্বারা সমতা করা সম্ভব না হয়, তখন সেই দ্বন্দ্বপূর্ণ হাদিসকে মাজাযী অর্থের উপর ব্যবহার করে সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস মুবারকসমূহের সাথে উহার দ্বন্দ্ব নিঃশেষ করা হবে। এ পদ্ধতি কিছু এখানেও হবে।

এখানে এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য মূল বিশ্বাসে তাওহীদের হাকীকতকে সাব্যস্ত করা এবং তা হচ্ছে যে, হাকীকী সাহায্যকারী শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সত্তা এবং বান্দা এস্তেগাসার বেলায় শুধু একটি অসীলা ও মাধ্যম।

এই হাদিস মুবারক শুধু জীবিতদের সাথে এস্তেআনত ও এস্তেগাসা নির্দিষ্ট হবার উপরও বুঝায়না, যা কিছু কিছু লোকের ধারণা; বরং এই হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ তো জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করার বর্হিভূত এবং সর্বদা গাইরুল্লাহর কাছ থেকে এস্তেগাসা করাকে নিষেধ করে। যার ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি।

মুনাফিকের কষ্ট দেওয়া এবং সৈয়্যদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এর বিরুদ্ধে হুযুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

[৯৮]. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১৫৯

দরবারে এস্তেগাসা করাও এরূপ। যদি এই হাদিস মুবারকের এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা না হয়, তাহলে এ হাদিস এবং অন্যান্য আয়াত, হাদিস ও আমলে সাহাবার সাথে সরাসরি দ্বন্দ্ব আবশ্যক হয়। হাদিসের কিতাবসমূহে বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা দোয়া করাতেন। তাঁর মহান অসীলা দিয়ে এস্তেস্কা করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এস্তেগাসা করাতে সকল উম্মতের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। সহীহ বুখারী সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উক্তি উল্লেখ আছে যে, অনেক সময় আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায়ে আনওয়ার দর্শনের মধ্যখানে হযরত আবু তালেবের এ পঙক্তিমালা স্মরণ করতাম, যাতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নীচে অবতরণ করার আগেই নালাসমূহে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হতো। সেই পঙক্তি হচ্ছে-

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

"এবং সেই শুভ্রতা যাঁর মুবারক চেহারার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, যিনি এতিমদের অভিভাবক এবং বিধবাদের আশ্রয়স্থল।"[৯৯]

সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ মুহাব্বতপূর্ণ পঙক্তি গুঞ্জন করে পাঠ করাটা সুস্পষ্ট করে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কতটুকু আত্মহারা হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এশক মুহাব্বতের সম্পর্ক রাখতেন। এবং যখনই তাঁদের কাছে কোন মুশকিল ও মুসিবত আপতিত হতো, তখনই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এস্তেগাসা, এস্তেআনত ও এস্তেদাদ (সাহায্য চাওয়া) এর জন্য চলে আসতেন। যখন সাহাবাদের আমল দ্বারা এই মতভেদযুক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে এবং তা কুরআন সুন্নাহ্‌র সম্পূর্ণ অনুকূল। তাহলে এ সকল অজ্ঞ লোকদের কুফর ও শিরকের ব্যাখ্যা ও ফতোয়াকে কিভাবে একত্ববাদের মূল হিসেবে মানা যাবে? শুধু একটি মতবিরোধপূর্ণ হাদিসের উপর আমল করতে গিয়ে এবং অন্যান্য সকল ইসলামী শিক্ষাগুলোকে উপেক্ষা করে সকল মুসলিম উম্মতের উপর কুফর ও শিরকের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া তাওহীদের কুরআনী শিক্ষা কখনো একথার অনুমতি দেয় না।

[৯৯]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ইস্তিস্কা, ১/১৩৭

পঞ্চম অধ্যায়

ঈমান ও কুফর এর মধ্যেকার পার্থক্য

ঈমান ও কুফর এর মধ্যেকার রূপক সম্পর্কের বর্ণনা

সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আউলিয়া, সালেহীনগণের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণ মাঝে মধ্যে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকেন যে, যদি সেই শব্দগুলো যেই অর্থে গঠিত সেই হাকীকী অর্থ অনুযায়ী বুঝে নিই, তাহলে তা শিরক ও কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে উচ্চারণকৃত শব্দগুলোর মাজাযী (রূপক) অর্থ উদ্দেশ্য হয় এবং বহুল প্রচলিত মাজায পাওয়া যাবার কারণে এরূপ ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত মাজাযী অর্থই উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিবর্গকে শিরকের মলিনতায় লিপ্ত বলা যাবেনা। যেমন-

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوْذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

"হে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি ছাড়া আমার কেউ (সাহায্যকারী) নেই, যার নিকট মুসিবত আপতিত হবার সময় আশ্রয় নিতে পারব।"

لِي خَمْسَةٌ اِطْفِي بِهَا حَرُّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ

اَلْمُصْطَفَي وَالْمُرْتَضَي وَأَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةُ

"আমার জন্য পাঁচজন (এমন বন্ধু) আছেন, যাদের সাহায্যে আমি ধ্বংসকারী বিপদের উষ্ণতাকে নির্বাপন করি (এবং তাঁরা হলেন) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী মুর্তযা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর দু'জন সাহেবজাদা (হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং সৈয়্যদা ফাতেমাতুয যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے

مجھے نظر کرم کی بھیک ملے مرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا

سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا

এভাবে কোন কোন সময় মুসলমানদের কেউ কেউ সরওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করে-

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি ব্যতীত আমাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই" ইত্যাদি বাক্যও বলে দেয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি এরূপ পঙক্তিমালা ও বাক্যের ব্যবহার হাকীকী অর্থের উপর করা হলে এরূপ উক্তির প্রবক্তাকে কাফের ও মুশরিক সাব্যস্ত করতে দেখা যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন মুসলমানের মনে এ সকল শব্দ ব্যবহার করার সময় হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। যারা এ সকল শব্দে আহ্বান করে, তারা এ আকীদা রাখে যে, আল্লাহ ব্যতীত শুধু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারই আমার জন্য আশ্রয়স্থল এবং আল্লাহর দ্বারের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ই আমি পাপী ও গুনাহগার এর ক্ষমার মাধ্যম ও অসীলা। এ কথাগুলোর অর্থ এটাই যে, খোদার সৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত আমার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কাছে অকাট্যভাবে আমার কোন আশা নেই। যদিও আমরা সাধারণতঃ তাওয়াস্‌সুল ও এস্তেগাসার সময় এরূপ অর্থ বিশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করি না এবং অন্যদেরকে এরূপ বাক্য ব্যবহার করার নির্দেশ দিই না, যাতে শিরকের ধারণাও না জন্মে এবং এরূপ শব্দ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা এটাও আবশ্যক বলে মনে করি যে, এরূপ বাক্যকে মাজাযীভাবে ব্যবহারকারীর উপর দ্রুত শিরক ও কুফরীর ফতোয়া জুড়ে দেয়াও জ্ঞানের কাজ নয়।

এ বিষয়টি আবশ্যক যে, এ সকল মুসলমানগণ একত্ববাদী হবার ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করতে হবে এবং মাজাযী অর্থকে দৃষ্টিতে রেখে শিরক ও কুফরের ফতোয়াগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা এ সকল একত্ববাদী আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের এমনই প্রবক্তা যেরূপ ইসলামী আহকামের জন্য জরুরী এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতেও সাক্ষ্য দেয়। নামায পড়ে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা ইসলারেম সকল বিধি-বিধানের অনুসরণ করে, তাহলে কতিপয় শব্দের মাজাযী ব্যবহারের অপরাধের কারণে তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে নিক্ষেপ করা কিরূপ বুদ্ধির কাজ? সৈয়্যদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ.

"আমাদের কেবলাকে কেবলা বলবে এবং যবেহকৃত ভক্ষণ করবে, তখন সে এমন মুসলমান, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিম্মা সাব্যস্ত আছে। তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীকে ভেঙ্গে দিওনা।"[১০০]

সহীহ বুখারীর এ হাদিস মুবারকের পর সাধারণ মুসলমানদেরকে মাজাযে আকলী (বিবেকপ্রসূত রূপকার্থ) এর বৈধ ব্যবহারকে মুশরিক সাব্যস্ত করার বৈধতা থাকে না। মাজাযে আকলীর ব্যবহার কুরআন, হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর আমলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান এবং একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। একজন মুমিনের কাছ থেকে এমন শব্দাবলী উচ্চারণ হওয়াকে মাজাযে আকলী সাব্যস্ত করাতে কোন প্রতিবন্ধক নেই। বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা অনুযায়ী যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলাই বান্দার খালেক ও মালিক এবং তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন কর্ম আঞ্জাম দেয়ার শক্তি দানে ধন্য করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের এখতিয়ারে কোন জীবিত ও মৃতের মনোবাসনার কোন শক্তি নেই। তবে এটা যে, খোদা স্বয়ং আপন মর্জিতে তার কামনা ও সুপারিশ কবুল করেন, এরূপ আকীদাপোষণকারী ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও মুসলমান। এটাই তাওহীদের মূল এবং এটাই ইসলামের মূল। যেমনিভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সৈয়্যদা মরিয়ম আরাইহাস সালামের সাথে কথোপকথনের মধ্যখানে আল্লাহ তা'আলার কর্মের সম্বন্ধ নিজের প্রতি করে মাজাযে আকলীর প্রকাশ করেছিলেন। কুরআন মজিদে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বাক্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

"যাতে আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবো।"[১০১]

যখন আল্লাহ তা'আলার নুরানী সৃষ্টির সর্দার এরূপ রূপক বাক্যের সম্বন্ধ নিজের দিকে করতে পারেন এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত স্বয়ং বাক্যগুলো স্বীয় কালামে মজিদে বর্ণনা করতে পারেন। তাহলে একজন মানুষ যদি একই বাক্যের সম্বন্ধ তাজেদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি করেন, তাহলে তাতে কী অসুবিধা রয়েছে? এ বিষয়টিই জরুরী যে, কুরআন মজিদের হাকীকী রূহ পর্যন্ত পৌছার এখতিয়ার করা হবে, যাতে মুসলমানরা

১০০. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুস সালাত, ১/৫৬, হাদীস : ৩৭৮
১০১. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম, আয়াত : ১৯

একে অপরকে কাফের বলার নিয়মটি ত্যাগ করে। এতেই ইসলামের উপকার বিদ্যমান এবং এতেই আমাদের সকলের ঈমানের কল্যাণ নিহীত।

শেষ কথা

এখানে আমরা সম্পূর্ণ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে গ্রন্থের প্রারম্ভে বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নতুন ধারায় আরও একবার বর্ণনা করতে চাই যে, বর্তমানকালে কিছু কিছু লোকেরা কুরআনের আয়াতের মধ্যে হাকীকত ও মাজাযের মধ্যেকার পার্থক্য ও ন্যায়সংগত বিষয়কে একেবারে ত্যাগ করেছে। তাদের আকীদা ও ধ্যান-ধারণা হচ্ছে কুরআনের শব্দাবলীর শুধু হাকীকী অর্থ দ্বারা দলীল লওয়া। যেহেতু তারা মাজাযী অর্থের বৈধতাকেও সন্দেহের চোখে দেখে সেহেতু তারা হাদিসে নববী, আসলাফ আইম্মায়ে কেরামের কুরআনী ব্যাখ্যা ও তাফসীর হতে মুখ ফিরিয়ে 'তাফসীর বিররাই' (মনগড়া তাফসীর) করে থাকে এবং ইসলামী আকাঈদের ব্যাপারে বিদ্‌আত সৃষ্টি করার এবং কুরআনী শব্দাবলির মৌলিক অর্থ থেকে সরে আকাঈদের নতুন ব্যাখ্যা বানানোর কাজে লিপ্ত থাকে। সঠিক মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত আরেকটি দল জেদের বশবর্তী হয়ে মাজাযের ব্যবহারে কিছু এভাবে অতিরিক্তের প্রবক্তা হয়ে আসছে যে, সঠিক মানদণ্ডের আঁচল হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে। অথচ সঠিক মানদণ্ডের বিবেচনা সর্বাবস্থায় আবশ্যক। হাকীকত ও মাজাযের ব্যবহারে কুরআনী মানদণ্ডকে বিবেচনায় রাখলে, এ দুটো শেষ পর্যন্ত বিশাল অনৈক্যের পর্দাকে ভেদ করে উম্মতকে আবারও একই শরীরে পরিণত করা যাবে। এই পন্থাটিই দ্বীনে হকের হেফাজত এবং তাওহীদের ক্ষেত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আবশ্যক ও কার্যকরী।

الحمد لله

(Alhamdulillah)

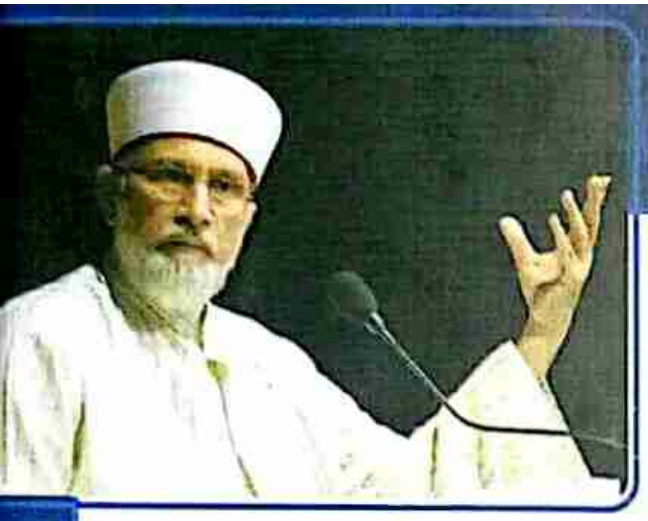

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল. এল. বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়্যিদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী(রহ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশিদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাযেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূভী আল-মালেকী আল মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল. এল. বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির সদস্য, তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহ সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংঘটন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

উর্দু, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত চার'শর উপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাধারা ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos Who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট'(ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটি'র চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিতে করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত কার হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।